জুম্ম সংবাদ বুলেটিন

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মুখপত্র

বুলেটিন নং ২৮ ॥ ১০ বর্ষ ॥ এপ্রিল ২০০২ ॥ বিশ্ব নারী দিবস সংখ্যা

সম্পাদকীয়

পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের উদ্যোগে তিন পার্বত্য জেলায় ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন হয়ে গেলো। 'জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান, নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম জোরদার করুন' আহবানকে সামনে রেখে সংগঠন দু'টির উদ্যোগে তিন পার্বত্য জেলায় নারী সমাবেশ ও র‍্যালীর আয়োজন করা হয়।

৮ মার্চ ১৮৫৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে সেলাই কারখানার নারী শ্রমিকরা অমানবিক কর্ম পরিবেশ, স্বল্প মজুরী এবং দৈনিক ১২ ঘন্টা শ্রমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে এক প্রতিবাদ মিছিল বের করে। সেই শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর পুলিশ হামলা চালায়। পরে ১৯১০ সালে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে জার্মান সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নেত্রী ক্লারা জেটকিন ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালনের প্রস্তাব দিলে তা গৃহীত হয়। নিউইয়র্ক শহরে প্রতিবাদী নারীদের সাহসী ভূমিকার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান পূর্বক সেই ৮ মার্চকে স্বীকৃতি দেয়ার ফলে দেশে দেশে নির্যাতিত, নিপীড়িত ও উপেক্ষিত নারী সমাজকে সংগ্রামী প্রেরণা যুগিয়ে আসছে। পরে ১৯৭৫ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হলে বিশ্বের দেশে দেশে প্রতি বছর এ দিবসটি পালিত হয়ে আসছে।

জুম্ম নারী সমাজ যুগ যুগ ধরে নির্যাতিত, নিপীড়িত, অবহেলিত ও বঞ্চিত। সাম্রাজ্যবাদী ও আমলা পুঁজিবাদী সর্বোপরি উগ্র জাতীয়তাবাদী ও মৌলবাদী শক্তির জাতিগত নিপীড়নের চরম শিকার হচ্ছে জুম্ম নারী সমাজ। বিগত আন্দোলনের সময় বাংলাদেশ সরকারের লেলিয়ে দেয়া নরপশুদের হাতে শত শত মা-বোন হারিয়েছে ইজ্জত ও সম্ভ্রম, হয়েছে অপহৃত ও হত্যার শিকার। কল্পনা চাকমার মতো অসংখ্য মা-বোন হারিয়ে গেছে চিরদিনের জন্য।

১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণে সামগ্রিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিস্থিতির কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি। জুম্ম নারী সমাজের মাথার উপর থেকে সরে যায়নি জাতিগত নিপীড়নের বীভৎস ছোবল। চুক্তি স্বাক্ষরের পর বিগত সাড়ে চার বছরে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের হাতে যৌন হয়রানির শিকার হয় ৭ জন কিশোরীসহ ১৩ জুম্ম নারী, নির্যাতনের শিকার হয় ১৫ জন নারী এবং গ্রেপ্তার হয় ৩ জন। এছাড়া বহিরাগত সেটেলারদের দ্বারা যৌন হয়রানির শিকার হয় ৫ জন কিশোরীসহ ১৭ জন জুম্ম নারী, অপহৃত হয় ৭ জন এবং মারধোর ও নির্যাতনের শিকার হয় ২১ জন জুম্ম নারী।

জাতিগত নিপীড়নের পাশাপাশি সামাজিক ও পারিবারিক জীবনেও জুম্ম নারী সমাজ বঞ্চনা ও বৈষম্যের নিষ্পেষণে পদদলিত হয়ে আসছে। তাই জুম্ম নারী সমাজও পুরুষশাসিত বেড়াজাল ও পারিবারিক দাসত্ব থেকে মুক্ত করে শাসক ও শোষকশ্রেণীর সর্ব প্রকারের জাতিগত ও সামাজিক নিপীড়ন, শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে বিশ্বের নারী মুক্তি আন্দোলনের সাথে সঙ্গতি রেখে আন্দোলন করে আসছে। জাতিগত ও সামাজিক নিপীড়ন, সর্বোপরি উগ্র জাতীয়তাবাদী ও মৌলবাদী শক্তির অপতৎপরতার বিরুদ্ধে জুম্ম নারী সমাজকে সামিল করার লক্ষ্যে সকল ক্ষেত্রে সুযোগ বঞ্চিত এই নারী সমাজকে প্রগতিশীল রাজনৈতিক চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ ও সজ্জিত করার উপযুক্ত পরিবেশ ও অনুকুল অবস্থা সৃষ্টির আহ্বান জানানো হচ্ছে। পাশাপাশি জুম্ম নারী সমাজকে পুরুষ বিদ্বেষী নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে প্রগতিশীল চিন্তাধারায় এগিয়ে আসার উদাত্ত আহবান জানানো হচ্ছে। প্রগতিশীলতার আলোকে নারী সমাজকে এগিয়ে নিতে না পারলে শোষিত ও বঞ্চিত নারী সমাজের প্রকৃত সমঅধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা কখনো সম্ভব হতে পারে না।

সূচী

পৃষ্ঠা

প্রবন্ধ

- আন্তর্জাতিক নারী দিবসের কথা ২
  জড়িতা চাকমা
- জুম্ম নারী ৩
  তাতিন্দ্র লাল চাকমা
- সংসদে নারীদের সংরক্ষিত আসন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রসঙ্গ ৪
  তনয় দেওয়ান
- জুম্ম সমাজে নারীর অবস্থান ৫
  ল্যরা চাকমা শাকুরা
- বিশ্ব নারী দিবস ও পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম নারী প্রসঙ্গ ৬
  বীর কুমার তংচঙ্গ্যা
- পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী সমাজ ব্যবস্থায় নারী ৭
  পারমিতা তংচঙ্গ্যা
- শহীদের তালিকায় আরেকজন ভূবনমণি চাকমা ৮
  পলাশ খীসা
- **Introducing English as a Common Language of Hill People in CHT... 9**
  S. Chakma Suhrid
- প্রসঙ্গ পর্যটন. ১১
  সুদীর্ঘ চাকমা

কবিতা

- এখনও আমরা অমানুষ ১২
  ল্যরা চাকমা শাকুরা
- বিভেদপন্থীদের প্রতি ১২
  তনয় দেওয়ান

এছাড়াও থাকছে মানবাধিকার লংঘনের উপর প্রতিবেদন

সংবাদ প্রবাহ

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের কথা

শ্রীমতি জড়িতা চাকমা

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। নিপীড়িত, নির্যাতিত মহিলাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার দিন। এই দিনের পেছনে রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস। এই ইতিহাস কোন দিন থেমে থাকে না। আর্ন্তজাতিক নারী দিবসের দিকে যদি দৃষ্টি ফিরাই তাহলে দেখি১৯১০ সালে জার্মান সমাজতান্ত্রিক নেত্রী ক্লারা জেটকিন নারী ও শ্রমিক আন্দোলনে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত হয়ে কোপেনহেগেনে সমাজতান্ত্রিক নারীদের দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ৮ মার্চ আন্তজার্তিক নারী দিবস হিসেবে উদ্‌যাপনের প্রস্তাব করেছিলেন ক্লারা জেটর্কিন। সেই দিনটি বেছে নেয়ার পেছনে রয়েছে অনেক ইতিহাস।

১৮৫৭ সালের ৮ মার্চ যুক্তরাষ্ট্রে নিউইর্য়ক শহরে সুঁই কারখানার নারী শ্রমিকরা অমানবিক কাজের পরিবেশ, অসম মজুরী, এবং দৈনিক ১২ ঘন্টা কাজের প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে এক মিছিল বের করা হয়। সেই নারী শ্রমিকদের শান্তিপূর্ণ মিছিলে পুলিশ নির্যাতন চালায়। অনেক মহিলা আহত হন ও অনেককে পুলিশ গ্রেফতার করে।

১৮৬০ সালের ৮ মার্চ। যুক্তরাষ্ট্রের নারী শ্রমিকরা তাদের একটা নিজস্ব সংগঠন শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন করে। ক্রমান্বয়ে সমাজে নারীর সমঅধিকার ও কাজের পরিবেশ উন্নতির জন্য মহিলা শ্রমিকদের আন্দোলন স্বীকৃতি পায়। পরিণতিতে ১৮৭১ সালে ফ্রান্সে নারী আন্দোলন বেগবান হয়ে উঠে।

১৯০৮ সাল ৮ মার্চে আবারও নিউইর্য়ক শহরে মিছিল বের করা হয়। এই সময় বস্ত্রশিল্পের কারখানার মহিলারা মিছিলে যোগ দেয়। তাদের দাবী ছিল- (১) কাজের ঘন্টা কমানো; (২) মানবেতর কাজের পরিবেশ উন্নতি; (৩) শিশু শ্রমের বিরুদ্ধে আইন ও (৪) ভোট দেবার অধিকার ।

১৯০৯ সনের ২৮ ফেব্রুয়ারীতে জাতীয় পর্যায়ে প্রথম বারের মতো যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় পার্টির উদ্যোগে জাতীয় নারী দিবস পালন করা হয় । এরপর ১৯১০ সালে ডেনমার্কে আর্ন্তজাতিক সমাজতান্ত্রিক সম্মেলনে নারী অধিকাব ও নারীর ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠার জনা আন্তর্জাতিক সম্মেলন করা হয়। এই সম্মেলনে সমাজতান্ত্রিক নেত্রী ক্লারা জেটকিন ৮ মার্চকে 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেন।

এই ইতিহাস থেকে আমরা জনতে পারি পুঁজিতান্ত্রিক শাসনের প্রতিবাদ জানানোর জন্য একটা ক্ষেত্র গড়ে উঠেছে। নারী দিবস মূলত শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন থেকে উদ্ভব হয়েছে।

পরবর্তী সময়ে এই নারী দিবস বিভিন্ন দেশে পালন করা হয়। ১৯১১ সালে ডেনমার্কের ঘোষণার পর প্রথম বারের মত আর্ন্তজাতিক নারী দিবস পালন করা হয় ১৯ মার্চ। পরে অষ্ট্রিয়া, জার্মানী, সুইজারল্যান্ডেও এ দিবসটি পালিত হয়।

১৯১১ সালের ২৫ মার্চ যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে অগ্নিকান্ডে বস্ত্রশিল্প কারখানার ১৪০ জন গার্মেন্টস শ্রমিক প্রাণ হারায়। এই দূর্ঘটনা শ্রম আইন প্রণয়নের জন্য এবং শ্রমিকের কাজের পরিবেশের জন্য নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

১৯১৩-১৪ সালে রুশ মহিলারা প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর শান্তির জন্য যে আন্দোলন সংঘটিত হয় তারই অংশ বিশেষ হিসেবে এ দিবস পালন করা হয়। পরবর্তীতে ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলোতে পালন করা হয়।

১৯১৭ সালে বিশ্বযুদ্ধে প্রায় ২০ লক্ষ সৈনিকের মৃত্যুর প্রতিবাদে রুশদেশের মহিলারা রুটি ও শান্তির দাবীতে ধর্মঘট আহবান করে। ১৯৪৫ সালের বিশ্বের জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদে নারীর সমানাধিকার ঘোষণা করা হলে সারাবিশ্বের গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে নারী আন্দোলনের জোয়ার শুরু হয়। এই অবস্থায় জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯৭৫ সালকে বিশ্ব নারী বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং ১৯৭৬-৮৬ সালকে নারী দশক হিসেবে ঘোষণা করে। পরবর্তীতে জাতিসংঘ ক্লারা জেটকিনের ঘোষণাকে সম্মান প্রদর্শন করে ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস দিবস হিসেবে গ্রহণ করে। তখন থেকে বিশ্বের দেশে দেশে ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

১৯৭৯ সালে ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণ বিষয়ক সনদ গৃহীত হয়। এই সনদ গৃহীত হওয়ার অর্থ নারীর সমঅধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটা যুগান্তকারী পদক্ষেপ। ১৯৮০ সালের ১ মার্চ থেকে এ সনদের উপর জাতিসংঘ সদস্যভূক্ত দেশসমূহের স্বাক্ষর প্রদান শুরু হয়। বাংলাদেশও এই সনদ অনুমোদন করে ১৯৮৪ সালের ৬ নভেম্বর স্বাক্ষর প্রদান করে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার উক্ত সনদে স্বাক্ষর করলেও সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের নারী সমাজের অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। এমনকি ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসটিও সরকারী ছুটির দিন হিসেবে এখনো গৃহীত হয়নি।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নারী আন্দোলন জোরদার হওয়ার সাথে সাথে বাংলাদেশেও বিভিন্ন নারী সংগঠন গঠনমূলক ভূমিকা ও উদ্যোগ নিতে থাকে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও অনেক শিল্প কারখানায় যেমন জুট মিল, টেক্সটাইল মিল, বস্ত্র শিল্প, গার্মেন্টস, ক্যামিক্যাল ফ্যাক্টরী ইত্যাদি কারখানাগুলিতে প্রচুর নারী শ্রমিক চাকুরীতে নিয়োজিত হতে শুরু করে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের নারী সমাজ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশীদারিত্বের দ্বার উন্মোচিত হতে থাকে। এ দেশের নারী সমাজ অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হয়ে দাড়ানোর ব্যাপারে সচেতন হতে আরম্ভ করে। শুধু তাই নয়, সমাজে তারা দিনরাত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাটুনী খাটছে, রাস্তায় ইট ভাট্টায় কাজ করছে। কিন্তু তাদের সামাজিক নিরাপত্তা, বাসস্থানের নিরাপত্তা এবং শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি নেই। আজকের এই দিবস তাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা, বাসস্থানের ও শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতির দাবী করছে।

বিশ্বের নারী মুক্তি আন্দোলনের সাথে সংগতি রেখে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম নারী সমাজও সমাজে নারীর সমঅধিকার ও সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলন করে আসছে। তৎকালীন জাতীয় সংসদ সদস্য ও জুম্ম জনগণের জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাই সত্তর দশকে সর্বপ্রথমে নারী মুক্তি কথা তুলে ধরেছিলেন। এ লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির উদ্যোগে ১৯৭৩ সালে জুম্ম নারীদের নিয়ে একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠন করা হয়। পরে ১৯৭৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী 'পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি' গঠন করা হয়। একই বছরে ১০ আগষ্ট প্রথম মহিলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন মিনুপ্রু মারমা এবং ৬৬ জন নারী প্রতিনিধি যোগদান করেন। এ সম্মেলনে মাধবী লতা চাকমা, জয়শ্রী চাকমা ও দীপ্তি চাকমাকে যথাক্রমে মহিলা সমিতির সভানেত্রী, সাধারণ সম্পাদিকা ও সাংগঠনিক সম্পাদিকা হিসেবে করে কমিটি গঠন করা হয়। উল্লেখ্য যে, ঐ বছর মহিলা সমিতির সদস্যরা সশস্ত্র প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে থাকে। নানা বাস্তবতার কারণে জুম্ম নারীদের পক্ষে সশস্ত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব না হলেও গ্রাম্য মহিলাদের সংগঠিত করা ও রাজনৈতিক সচেতন করাসহ জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্যদের সহায়তা দিয়ে আন্দোলনে ভূমিকা পালন করে থাকে।

সশস্ত্র আন্দোলনের পাশাপাশি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে জুম্ম নারী সমাজকে, বিশেষতঃ জুম্ম ছাত্রী সমাজকে আন্দোলনে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ১৯৮৮ সালের ৮ মার্চ 'হিল উইমেন্স ফেডারেশন' গড়ে উঠে। এ সংগঠনের মাধ্যমে জুম্ম নারী সমাজ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১৯৯৪ সালের ৪ সেপ্টেম্বর তারিখে চীনের রাজধানী বেইজিংএ অনুষ্ঠিত 'বিশ্ব নারী সম্মেলনে' হিল উইমেন্স ফেডারেশনের প্রতিনিধি বর্তিকা চাকমা ও কবিতা চাকমা যোগদান করে থাকে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির গঠনতন্ত্রের প্রস্তাবনায় উল্লেখিত ভাষায় বলতে হয়, 'আজ সারা বিশ্বের নারী জাতি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে সকল প্রকারের শোষণ, নির্যাতন, নিপীড়ন, অত্যাচার ও অন্যায়ের নাগপাশ ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে চলেছে। নারী জাতি মাথা তুলে দাঁড়াবার তথা সমাজ জীবনে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার শ্লোগান আজ বিশ্বের দিকে দিকে ধ্বণিত হচ্ছে এবং ক্রমশঃ পুরুষ জাতির পৌরুষ ও স্বামীত্বের বর্বর ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। সুতরাং এই শোষিত, নিপীড়িত, নির্যাতিত, বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত জুম্ম নারী সমাজকে পুরুষশাসিত বেড়াজাল ও পারিবারিক দাসত্ব থে মুক্ত হওয়ার সংগ্রামে নারীকে অবশ্যই অংশীদারী হতেই হবে।' মহিলা সমিতির এই সংগ্রামী আহবান জানিয়ে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন ৮ই মার্চ আর্ন্তজাতিক নারী দিবস ২০০২ উদযাপন করছে।

জুম্ম নারী

তাতিন্দ্র লাল চাকমা

সমাজে পুরুষরা তিনটি শাসনে শাসিত; যেমন- রাষ্ট্রীয় শাসন, সামাজিক শাসন ও ধর্মীয় শাসন। কিন্তু জুম্ম সমাজে নারীরা অতিরিক্ত আরও একটি শাসনে শাসিত হয়। এই অতিরিক্ত শাসন হচ্ছে পুরুষের শাসন। বিশেষতঃ সমাজ বিকাশের একটা পর্যায়ে এসে 'জননী আইন' যখন রহিত করা হয় তখন থেকে সমাজে নারীরা পুরুষের শাসনের আওতায় এসে যায় সরাসরি।

ইতিহাসে জুম্ম সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রে দাস প্রথার খুব একটা উদাহরণ পাওয়া যায় না। তবে যেটুকু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তা হচ্ছে সামন্ত সমাজের অস্তিত্ব। এই সামন্ত সমাজে উৎপাদন ব্যবস্থা যেমন সহজ সরল তেমনি সামাজিক চিন্তা-চেতনাও সহজ সরল, গতানুগতিক ও পশ্চাৎপদ। অতএব এই সামন্ত সমাজে নারীদের অবস্থানও অত্যন্ত গতানুগতিক। আতুর ঘর, রান্নার ঘর ও শয়ন ঘর - এই তিন গতানুগতিক ব্যবস্থার মধ্যে সাধারণতঃ জুম্ম নারীদের জীবনচক্র। তাই অতি সাদামাথায় বলা হয় চার দেয়ালের মধ্যেই এই নারী জীবনের শুরু এবং শেষ। তাই গতানুগতিক চিন্তা পশ্চাদপদতা এসবই প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়।

আবার সামন্ত উৎপাদন ব্যবস্থা সহজ সরল হওয়াই জুম্ম নারীরা উৎপাদনের সকল ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করে থাকে। সেই দিক থেকে জুম্ম পুরষ আর নারীর মধ্যে তুলনা করলে দেখা যায় যে, পুরুষদের চাইতে নারীদেরকে বেশী পরিশ্রমী ও দায়িত্বশীল হতে হয়। কারণ একজন জুম্ম নারীকে পুরুষের পাশাপাশি জমিতে অথবা জুমে উৎপাদন কাজে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হয়। আবার বাড়ীতে এসে নারীকে রান্নাবান্নার যাবতীয় দায়দায়িত্ব পালন করতে হয়! পুরুষরা বাড়ীতে এসে অবশ্যই মাতব্বর সেজে বসে। আর নারীরা যদি রান্নায় দেরী করে বা ভাল খাবার কিংবা উপাদেয় খাবার দিতে না পারে তখন একটু খুঁট পেলে পুরুষ হালের বলদ যেভাবে পেটায় সেভাবে পেটাতে অনেকে দ্বিধা করে না। এছাড়াও যাবতীয় সন্তান লালন পালনের প্রত্যক্ষ এবং সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করতে হয় নারীকে। তারপরেও পুরুষের মন জয় করতে না পারলে জুম্ম নারীদের অবস্থা নানাভাবে বিপদগ্রস্থ হয়ে পড়ে। বিগত সশস্ত্র আন্দোলনের সময়ে এবং পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বর্বোরোচিত হামলার শিকার হতে হয়েছিল এই জুম্ম নারীদেরকেই; রাজনৈতিক প্রতিহিংসার লালসায় পরিণত হতে হয়েছিল তাদের। এখনো সেই পাশবিক শিকার হতে এখনো মুক্ত হতে পারেনি জুম্ম নারী সমাজ।

জুম্ম সমাজে মেয়েদের বিয়ে-সাদী করতে যৌতুক প্রথার প্রচলন নেই। তবে পুরুষ শাসিত সমাজ হিসেবে নারীদের সম্পত্তি লাভের অধিকার তেমন স্বীকৃত নয়। তাই একজন নারী পুরুষের চাইতে সহায় সম্বলহীন এক অবলা - যার জীবনে একটুখানি টক্কর খেলে বিপদগ্রস্থ হতে বাধ্য। মা বাবার আশ্রয় ছেড়ে যাবার পর একজন নারীকে এই কারণে বাধ্য হয়ে পুরুষের মন তুষ্ট করে চলতে হয়। তাই কোন পুরুষের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, প্রতিবাদ করা এই অবলা নারীর পক্ষে আর সম্ভব হয় না। গ্রাম্য সমাজে প্রচলিত কথা হচ্ছে - মেয়েরা কুড়িতে বুড়ি। অর্থাৎ বিশ বছরের বয়স হলে বুড়ী হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করে কিন্তু একজন পুরুষকে কখনও সেভাবে বিবেচনা করা হয় না। জুম্ম সমাজে নারী পুরুষের যে বৈষম্য তা প্রচলিত সামন্ত সমাজে এভাবেই প্রতিফলন ঘটে। সমাজে এইরূপ অসহায়ত্বকে বুকে নিয়ে জুম্ম নারীরা সাধারণতঃ একটু ধর্মপ্রাণ হয়। কিন্তু ধর্মও কি সমান মর্যাদা দেয়?

বৌদ্ধ ধর্ম হচ্ছে পৃথিবীর অন্যতম সংগঠিত ধর্ম। কিন্তু সেই ধর্মের মধ্যেও মেয়েরা হচ্ছে মায়াবিনী। তারা 'মার' এর বেশে পুরুষের ধ্যান ভঙ্গ করে দেয়। এমনকি কেউ কেউ ধর্মীয় উপদেশ দেয়- নারীদের বেশী বেশী ধর্ম করা উচিত যাতে পরজন্মে পুরুষ হিসেবে ভাগ্যবান মানুষরূপে জন্ম নিতে পারে। এইসব আপ্তবাক্যের অন্তরালে নারীকে হেয় করা, নারী জাতিকে অসহায় বা পুরুষের চাইতে নারীকে নিকৃষ্ট হিসেবেই ভাবতে শেখায়, নারীকে বেশ্যাবৃত্তি করতেই উৎসাহিত করে।

অধুনিক যুগে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ও ধনবাদী সমাজের প্রভাবে জুম্ম সমাজও যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত হতে চলেছে। কিন্তু সেই সমাজেও নারী অধিকার স্বীকৃত নয়। এই সমাজও নারীদের ভোগ্যপণ্যের মতোই বিবেচনা করে। সমগ্র বাংলাদেশে নারীরা এখনও পুরুষের মত সমান রাজনৈতিক মর্যাদার অধিকারী নয়। কিন্তু বিগত ১৯৯৭ সালে সম্পাদিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে জেলা পরিষদে তিনজন নারী ও আঞ্চলিক পরিষদে তিন জন নারী আসন সংরক্ষণের বিষয়টি আইনগতভাবে স্বীকৃত করা হয়েছে। নারীর জন্য এইটুকু স্বীকৃতিও যথেষ্ট নয়। কিন্তু তা সত্বেও সমগ্র সমাজে ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় যেখানে নারীদের বিষয়টি সুনির্দিষ্ট নয় সেখানে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি দাবী আদায় করতে নারী সমাজকে বাদ দেয়নি। তার কারণ জনসংহতি সমিতির মধ্যে গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল চিন্তাধারার যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে।

জুম্ম নারীরাও মুলত প্রগতিবাদী। কারণ তারা সমাজে সরাসরি উৎপাদন সংগ্রামের সাথে জড়িত। এমনকি জুম্ম পুরুষের তুলনায় তারা আরও বেশী সৃজনশীল ও সংরক্ষণবাদী। আজও জুম্ম সমাজে দেখা যায় নারীরা ক্ষেতের কাজ ও গৃহস্থালীর কাজের পাশাপাশি নিজেদের প্রয়োজনীয় পিনোন খাদি, বরগী (গিলাপ)সহ নানা শিল্পকর্মে জড়িত। একজন জুম্ম পুরুষ বাড়ীতে বসে বাঁশ বেত দিয়ে শিল্প নৈপুণ্যের প্রদর্শনী করতে পারে। কিন্তু তার চাইতে জুম্ম নারীরা অনেক বেশী পারদর্শী এমনকি এটা সমাজের প্রতিটি নারীর শৈল্পিক গুণাগুণ অর্জন একটা বিধিসম্মত ব্যাপার।

সমাজে বিভিন্ন অপসংস্কৃতির প্রভাব সত্বেও জুম্ম নারীরা আজও জাতিগত স্বাতন্ত্র্যতার একমাত্র বাহন ও একমাত্র সংরক্ষক। সেদিক থেকে জুম্ম জাতীয়তাবাদী আদর্শের প্রতীক হিসেবে নারীরাই সবচাইতে বেশী দাবীদার। কারণ একমাত্র তাদের শিল্পকর্মের মধ্যেই সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠে একজন জুম্ম যেকোন জাতি থেকে স্বতন্ত্র ও আলাদা।

কিন্তু তারপরও সামগ্রিক বিচারে জুম্ম নারীরা সমাজে চরমভাবে অবহেলিত। কারণ সমাজে উৎপাদন সংগ্রামে তাদের যত বড় অবদানই থাকুক জুম্ম সামাজিক রীতিতে তারা কোন সম্পত্তির ভাগীদার নয়, এমনকি মাতা কিংবা পিতার উত্তারাধিকারীও হতে পারে না। এটাই হচ্ছে সমাজে অধিকারহীনতা। নারীকে বংশের মর্যাদা রক্ষা করতে হয়; বংশের ঐশ্বর্য ও গৌরব বাড়িয়ে তুলতে হয় কিন্তু সেই ঐশ্বর্য বৈভব কিংবা মর্যাদার অধিকারী তারা হতে পারেন না। তাই প্রচলিত সমাজে নারীর সামাজিক মূল্যায়ণ যথাযথভাবে হতে পারে না। তাই এই সমাজের পরিবর্তনের জন্য জুম্ম নারীদেরও এগিয়ে আসা জরুরী। কিন্তু সামন্ত প্রথা কিংবা ধনবাদী প্রথা কোন প্রথাতে জুম্ম নারীরা পুরুষের সমান সম্পত্তির অধিকার কিংবা মর্যাদার অধিকারী হতে পারে না। পৃথিবীতে একমাত্র গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল সমাজই নারী পুরুষের সমান মর্যাদা দিতে পারে। ইতিহাস প্রমাণ করে দিয়েছে যে, নারী জাতি সমাজে সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে পুরুষ সমাজকে তোষণ করেছে, প্রশান্তি দিয়েছে। কিন্তু সামাজিকভাবে সুনির্দিষ্টভাবে কিছুই পায়নি। তাই ভাবতে হবে আগামীতে এমন একটা সমাজ গড়ে তোলা উচিত যেখানে নারী পুরুষের যেমনি সমান ভূমিকা থাকবে তেমনি পুরুষের মত নারীদেরও সমান অধিকার ও সমমর্যাদা থাকবে।

> নারীর যে অধিকার সেটা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত। নারীকে যদি অধিকার দিতে হয় তাহলে পুরুষ যে অধিকার ভোগ করে সে অধিকার নারীকেও দিতে হবে।
>
> *-এম এন লারমা*

সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রসঙ্গ

তনয় দেওয়ান

গত ১৭ জানুয়ারী 'জাতীয় সংসদের বেসরকারী সদস্যদের বিল ও সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি' দেশের মোট ৬৪টি জেলার জন্য ৬২টি সংরক্ষিত মহিলা আসন সংক্রান্ত সংবিধান সংশোধন বিল অনুমোদন করেছে। যার মধ্যে দেশের অপরাপর ৬১টি জেলার জন্য ৬১টি আসন এবং ৩টি পার্বত্য জেলার জন্য ১টি আসন করার প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন ঢাকা-২ আসন থেকে নির্বাচিত বিএনপি দলীয় সংসদ সদস্য জনাব আব্দুল মান্নান।

বিএনপি নেতৃত্বাধীন ৪ দলীয় জোট সরকারের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে এবং তাই এই সরকারের আমলে সংরক্ষিত মহিলা আসন বিষয়ে বিল পাস হবে বলে নিশ্চিত ধরা যায়। যা বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে করা সম্ভব হয়নি। ইতিমধ্যে জাতীয় পর্যায়ে নারী সমাজের পক্ষ হতে সংরক্ষিত মহিলা আসনে সরাসরি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচনের দাবীও উচ্চারিত হয়েছে। বলা যায় নারী সমাজ আশাবাদী ও তাদের ক্ষমতায়ন এবং সম-মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় এই বিল ভূমিকা রাখবে বলে মনে করে।

কিন্তু জনাব আব্দুল মান্নানের এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে কমিটির গৃহীত সিদ্ধান্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের নারী সমাজ তথা সকল সচেতন মহলকে অত্যন্ত বিচলিত করেছে এবং বিশেষ করে নারী সমাজ এতে ক্ষোভ প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছে। তাই ২৮ ফেব্রুয়ারী তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বস্তরের জনগণের পক্ষ হতে প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে একটি স্মারকলিপি প্রদানের মাধ্যমে তার প্রতিবাদ জানানো হয়েছে এবং ন্যায় সঙ্গত দাবী তুলে ধরা হয়েছে। যেখানে উল্লেখ করা হয় যে, *"বিগত ১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী ঢাকা জেলার জনসংখ্যা ৫৮,৪০,০০০ জন এবং মেহেরপুর জেলার জনসংখ্যা ৪,৯২,০০০ জন; অথচ মেহেরপুর ও ঢাকা উভয় জেলার জন্যও একটি করিয়া আসন প্রস্তাব করা হইয়াছে। আপনি অবগত আছেন যে, দেশের এক দশমাংশ অঞ্চল জুড়িয়া এই তিন পার্বত্য জেলায় দশ ভাষাভাষি অনগ্রসর আদিবাসী উপজাতি বসবাস করিয়া আসিতেছে। তাহা ছাড়া ১৯৯১ সালের আদম শুমারী অনুসারে রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার জনসংখ্যা যথাক্রমে ৪,১০,০০০; ২,৩১,০০০ ও ৩,৪২,০০০ জন। তাই জনসংখ্যার অনুপাতের ক্ষেত্রে ঢাকা ও মেহেরপুরের আকাশ পাতাল পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও মেহেরপুরের মতো কম জনসংখ্যা সম্পন্ন জেলার জন্য যদি একটি করিয়া আসন নির্ধারণ করা হয় তবে তিন পার্বত্য জেলার জন্য একটি করিয়া মহিলা আসন সংরক্ষণ করাও অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত। অন্যথায় পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকতর পশ্চাদপদ ও বঞ্চিত মহিলা সমাজের প্রতি চরম বৈষম্য করা হইবে বলিয়া আমরা মনে করি।"*

সঙ্গত কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের মহিলাদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন 'পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি' সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের লক্ষে ২৪ মার্চ ঢাকায় জাতীয় প্রেস ক্লাবে প্রেস কনফারেন্স করে আবার তিন পার্বত্য জেলায় প্রতিটিতে একটি করে মোট ৩টি সংরক্ষিত মহিলা আসন সংরক্ষণের দাবী জানিয়েছে। 'পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি'র দাবীর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে সমর্থন প্রদান করেছে দেশের বিভিন্ন নারী সংগঠন। তার মধ্যে রয়েছে- হিল উইমেন্স ফেডারেশন, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, সম্মিলিত নারী সমাজ, নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, নিজেরা করি ও কর্মজীবি নারী। এই সাংবাদিক সম্মেলনে পার্বত্য জেলাসমূহতে কেন প্রতিটিতে একটি করে মোট তিনটি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন করা দরকার ও ন্যায়সঙ্গত তার পক্ষে ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয়।

এখানে আরও উল্লেখ্য যে, ২০০০ সালের ৯ অক্টোবর তারিখে বৃটিশ কাউন্সিল কর্তৃক আয়োজিত Womens in National Politics শীর্ষক ওয়ার্কসপে যে Recommendation করা হয় তাতে বলা হয় যে,' Major political parties represented that the number of reserved seats should be increased. However, a consensus is yet to be reached regarding the exact figure. Some members of the womens movement have proposed that there should be 150 reserved seats while others opted for 100, and a major portion advocated for 64 seats, one from each District. Majority of the participants of the workshop, including some women MP's, opined the number is the most practical proposal given the social and political reality of Bangladesh.'। এই সেমিনারে আওয়ামী লীগ সরকারের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত, বিএনপির সাংসদ ড. মঈন খান (বর্তমান ৪দলীয় জোট সরকারের মন্ত্রী)সহ বিশিষ্ট নারী অধিকার কর্মী, আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব ও খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবিগণ উপস্থিত ছিলেন।

এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, জনাব মান্নানের প্রস্তাবটি পর্যবেক্ষণ করলে এটা স্পষ্টত- জনসংখ্যার উপর ভিত্তি না করে বরং জেলা সংখ্যার উপর ভিত্তি করেই সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের প্রস্তাবটি করা হয়েছে। কিন্তু তিন পার্বত্য জেলাসমূহকে কেন একটি মাত্র আসনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হলো তা রহস্যজনক এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত। কেননা পার্বত্য জেলাসমূহ হলো সবচেয়ে অবহেলিত ও বঞ্চিত। শুধু তাই নয় ভৌগোলিকভাবে বিশাল এবং যাতায়াতের ক্ষেত্রেও দুর্গম। তাই এসব বিচারেও তিন পার্বত্য জেলায় একটি করে মোট তিনটি সংরক্ষিত মহিলা আসনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

তাহলে আমরা কি ধরে নেব বর্তমান বিএনপি সরকারও বিগত সময়ের সরকার সমূহের মতো পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে বিমাতাসুলভ মনোভাব অক্ষুন্ন রেখেছে? কেননা আমরা জানি, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা হবার পর থেকেই পার্বত্যবাসীকে চরম অবহেলা ও বঞ্চনার মধ্যে নিপতিত করা হয়েছে। ১৯৭২ সালে গণ পরিষদে বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হবার সময়েও পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের পক্ষে তদানীন্তন গণপরিষদ সদস্য শ্রী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার উত্থাপিত দাবীনামাসমূহের প্রতি মুল্যায়ণ করা হয়নি। সেসময় থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের চাওয়া পাওয়ার স্বীকৃতির বিপরীতে দমণ ও বিলোপের নীতি গ্রহণ করে দীর্ঘদিন ধরে সংঘাতের পথে ঠেলে দেয়া হয়েছে। বাধ্য করা হয়েছে অগণতান্ত্রিক সংগ্রামের ইতিহাস সূচনা করতে। অন্যায়ভাবে দীর্ঘ দু'যুগেরও অধিককাল ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামকে অবরুদ্ধ ও পশ্চাদপদ করে রাখা হয়েছে। বঞ্চিত ও নিপীড়িত হয়েছে এখানকার সহজ সরল শান্তিপ্রিয় মানুষ। পরিণতিতে অস্বীকার ও উগ্রতার নীতির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা দেশের একটি জটিল জাতীয় রাজনৈতিক সমস্যায় পরিণত হয়।

সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আমল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে সরকারসমূহের শুভ বুদ্ধি উদয়ের সূচনা। তখন আলোচনার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু তা দেশের অগণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার কারণে মুখ থুবড়ে পড়ে। পরবর্তী সময়ে এরশাদ সরকার, খালেদা জিয়ার সরকারের আমলে তা অব্যাহত ছিল; যার পরিণতিতে শেখ হাসিনার সরকারের সাথে একটি চুক্তির মাধ্যমে জটিল রাজনৈতিক সমস্যা সুরাহার পথ উন্মুক্ত করা হয়। এই চুক্তিতে সংবিধানে অস্বীকৃতির অভিশাপ মুছে ফেলার জন্য সংসদীয় আইনের মাধ্যমে তা দুরীকরণের চেষ্ঠা করা হয়েছে। যদিও সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেবার মতো সংখ্যাগরিষ্ঠতা শেখ হাসিনা সরকারের ছিল না।

তাই লক্ষ্যণীয় যে, সংবিধান প্রণয়নের সময় হতেই পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ করা হয়েছে। তারপরও সংবিধানের ২৮ নং অনুচ্ছেদের ৪ দফানুসারে "নারী বা শিশুদের অনুকুলে কিংবা নাগরিকদের যেকোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।" এই অনুচ্ছেদের আওতায় ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর তারিখে সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের পক্ষে জনসংহতি সমিতির সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যা অনগ্রসর ও পশ্চাদপদ উপজাতীয় জনগণকে জাতীয় স্রোতধারায় মিলিত হয়ে দেশ গঠনে এগিয়ে আসার পথ প্রশস্থ করে দেয়। এই চুক্তিতে 'ক' খন্ডের ১নং ধারায় অত্র অঞ্চলকে 'পশ্চাদপদ উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল' হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে।

এই চুক্তির আওতায় বর্তমানে তিন পার্বত্য জেলাকে নিয়ে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ' এর মাধ্যমে একটি আঞ্চলিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাতে ৩টি সংরক্ষিত মহিলা আসন রাখা হয়েছে। শুধু তাই নয় ৩টি পার্বত্য জেলা পরিষদে প্রতিটিতে তিনটি করে সংরক্ষিত মহিলা আসন রাখার বিধান করা হয়েছে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে নিষ্পেষিত নারী সমাজের কথা বিবেচনা করে উক্ত বিধানসমূহ রাখা হয়। বর্তমানে সংসদের সংরক্ষিত

মহিলা আসন যদি একটি মাত্র করা হয় তবে বঞ্চিত নারী সমাজের যে আশা আকাংখার সৃষ্টি হয়েছে তাও ধুলোয় মিশে যাবে।

এটা স্পষ্টত যে, জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের ভূমিকাকে খর্ব করা ও বঞ্চিত রাখার যে ধারাবাহিক প্রবণতা যুগ যুগ ধরে চলে আসছিল এটাও তার একটি নীলনক্সা। বর্তমানে দেশের এক দশমাংশ অঞ্চল হওয়া সত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রামে কেবল মাত্র ৩টি সংসদীয় আসন রয়েছে। এই আসনগুলোও ভৌগোলিক ও জাতি সংখ্যার অনুপাতে অপ্রতুল। এমতাবস্থায় সংরক্ষিত মহিলা আসন যদি একটি করা হয়, তবে তা হবে আরও শোচনীয়। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে সবসময় জাতীয় স্রোতধারায় মিশে যাবার আহ্বান জানানো হয়ে থাকে। তাই এখন প্রশ্ন জাগে- যেখানে শাসক গোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে জাতীয় স্বার্থের সাথে মেলাতে চায় না, জাতীয় মান মর্যাদার সমান মর্যাদা দিতে চায় না সেখানে কিভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ জাতীয় স্রোতে মিশতে পারবে?

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করার মতো সেটি হলো পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের জন্য যারা দরদ দেখান সেসব তথাকথিত ব্যক্তি ও সংগঠন এবিষয়ে নিশ্চুপ রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অর্ধেক অংশ মহিলারা সংসদে প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এতে তাদের কোন ক্ষোভ বা প্রতিবাদ নেই। যারা পার্বত্য চট্টগ্রামকে কথায় কথায় দেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করেন তারাও এব্যাপারে মুখ খুলছেন না। আরও মজার ব্যাপার হলো তথাকথিত ব্যক্তি ও সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ফলে এখানকার বাঙালীরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়েছেন বলে সাম্প্রদায়িকতা ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করলেও জাতীয় সংসদে যে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলার জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার খর্ব করা হচ্ছে সে বিষয়ে নীরব। বরং সংসদে বর্তমান সরকার চরম বঞ্চনার নীতি বাস্তবায়িত করতে যাচ্ছে দেখে তাতে তারা দিব্যি স্বস্তি পাচ্ছে। শুধু তাই নয়, বিরোধী দল আওয়ামী লীগও এব্যাপারে মোটেও সরব নয়। ব্যক্তি শেখ হাসিনার নিরাপত্তা আইন বাতিল হলে আওয়ামী লীগ হরতাল পর্যন্ত করে অথচ শেখ হাসিনার মতো লাখো নারী যে পার্বত্য চট্টগ্রামে বঞ্চিত হচ্ছেন সে বিষয়ে তাদের কোন উদ্বেগ বা প্রতিবাদ নেই।

পরিশেষে এটা বলা সমীচিন হবে যে, বঞ্চনা ও নিপীড়ন করার নীতি হতে বর্তমান সরকারকে অবশ্যই সরে আসতে হবে। দেশের একটা অঞ্চলের প্রতি বৈষম্য ও অন্যায় করার নীতির ইতি টানতে হবে। বর্তমান সময়ে নারীর ক্ষমতায়ন ও গণতন্ত্র সুদৃঢ় করে নারী-পুরুষের সম মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিটি জেলায় একটি করে সংরক্ষিত মহিলা আসন করতে হবে। দেশের নারী সমাজের সার্বিক উন্নতি, সম অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য এই সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করে যোগ্য ও জনসমর্থিত মহিলাদের নির্বাচিত করার গণতান্ত্রিক অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে। তাই সকল বিবেকবান, সচেতন, গণতন্ত্রমনা ও প্রগতিশীল ব্যক্তি ও সংগঠন তিন পার্বত্য জেলাসহ প্রতিটি জেলায় একটি করে নারীদের সংরক্ষিত আসন ও সেই আসনে সরাসরি নির্বাচন দাবী করে সংগঠিত ও সোচ্চার হবেন- এই আহ্বান রাখছি।

জুম্ম সমাজে নারীর অবস্থান

ল্যরা চাকমা শাকুরা

নারী সম্ভবত মহাজগতের সবচেয়ে আলোচিত বিষয়। এই নারী বিষয়ক আলোচনায় অংশ নিয়েছে প্রতিপক্ষের সবাই। কেবল যার সম্পর্কে আলোচনা সেই-ই বিশেষ সুযোগ পায়নি আলোচনায় অংশ নেয়ার। অন্ধ ও বধির, লম্পট ও ঋষি, পাপী ও প্রেরিত পুরুষ, দালাল ও দার্শনিক, কবি ও কামুক, বালক ও বৈজ্ঞানিক অর্থাৎ সমস্ত পুরুষ প্রজাতিই অংশ নিয়েছে নারী আলোচনায়। এ প্রতিপক্ষ কখনো নারীর অধিকার স্বীকার করেনি, এমনকি এদের অস্তিত্ব স্বীকার করার প্রয়োজন বোধ করেনি। তারা বরাবরই নারীকে দেখে এসেছে দাসীরূপে, সমকক্ষরূপে নয়। বরং প্রতারণা করে এসেছে সেই প্রথম থেকেই। কেবল এই নারীকে বন্দী করার জন্যই প্রতিপক্ষ সৃষ্টি করেছে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র। উদ্ভাবন করেছে ঈশ্বর, লিখেছে ধর্মগ্রন্থ, অজস্র দর্শন, কাব্য-মহাকাব্য, সৃষ্টি করেছে বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও আরো অসংখ্য শাস্ত্র। কখনোই কি সম্ভব পুরুষতন্ত্রের এতদিনের চক্রান্তকে, পীড়নকে নিমেষে নিষ্ক্রিয় করে দেয়া? পৃথিবী জুড়ে যতই সামাজিক বিপ্লব ঘটুক না কেন পুরুষতন্ত্রই যেহেতু নারীর শোষক, তাই পুরুষ মুক্তি পেলেও নারী মুক্তি পায় না। তাকে মুক্তি দেয়া হয় না। সবাই তখন ভুলে যায় নারীর কথা। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা তখন প্রয়োজন হয় কেবল পুরুষতন্ত্রের ক্ষেত্রে। তাই দেখা যায় নারীই একমাত্র শোষিত, নির্যাতিত ও সর্বহারা। প্রকৃতপক্ষে তার যা দরকার তা হচ্ছে মুক্তি। আদিম সমাজে নারীর অবস্থান কেমন ছিল তা সঠিক বলা যায় না। হয়ত তখন কিছুটা সাম্যবাদ ছিল। যাই হোক অন্তত আজকের বুর্জোয়া শ্রেণীর নারীদের মত ভঙ্গুর তারা কিছুতেই ছিল না। আসলে নারীর দুর্দশা ঘনিয়ে আসে কৃষি পর্বের পর পরই। মানুষ যাযাবর হতে স্থির হয় কোন উর্বর সমৃদ্ধ অঞ্চলে। তখন তার ভূমিকা ভূ-স্বামীতে বদলে যায়। এবং ঠিক তখনই তার চেতনায় এসে যায় নারী অধিকার হরণের। নারীকে দেখতে শুরু করে নিজেদের সমকক্ষরূপে নয়, বরং গৃহদাসীরূপে। পুরুষ যখন জমির মালিক হয়, সে তখন দাবী করে নারীর মালিকানাও। সম্পদ যত বাড়তে থাকে পরিবারে নারীদের থেকে গুরুত্ব বাড়তে থাকে পুরুষদের এবং পুরুষেরাই উদ্যোগ নেয় মাতৃধারার প্রথা ভেঙে পিতৃধারার প্রথা সৃষ্টিতে। এটা নিঃসন্দেহে একটা বিপ্লব। কিন্তু এবিপ্লবে কোন রক্তপাত ঘটেনি। কোন ত্যাগ স্বীকার করতে হয়নি পুরুষতন্ত্রকে। মাতৃ অধিকার উচ্ছেদের পর পুরুষ দখল করে গৃহের কর্তৃত্ব। স্ত্রী জাতির এই ঐতিহাসিক পরাজয়ের ভার আজও পৃথিবীর প্রত্যেক নারীকে বহন করতে হচ্ছে এবং বাধ্য হচ্ছে মানবেতর জীবন যাপনে। আর এসব কিছু থেকে ব্যতিক্রম নয় আমাদের জুম্ম নারীরাও।

সমস্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম জুড়ে নারীরা এখনো শিক্ষা থেকে দুরে। তারা এখনো লালন করে আসে সেই আদিকালের চিন্তাধারা। স্বাধীনতা নামের শব্দটি থেকে তারা সম্পুর্ণ বহির্ভূত। অন্ধকার জীবন যাপনে তারা এতটা অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে তাদের কখনো অনুভূত হয় না তারা বঞ্চিত। তাই তারা পরগাছার মতো জীবন যাপনে কখনো কুণ্ঠাবোধ করেনি। বরং যারা তাদের ভরণ পোষণ করে তাদের সমৃদ্ধির সাথে আপ্রাণ চেষ্টা করে নিজেদের জীবনকে জড়িয়ে রাখার। এসব নারীরা কখনো নিজেদের মুক্তির কথা কল্পনাও করতে পারে না। কতিপয় শিক্ষিত নারী সামাজিক এই নিয়ম ভাঙার সাহস দেখালেও রক্ষণশীল পুরুষতন্ত্র তাকে কখনো সমর্থন করেনি। বরং সীমাহীন সমালোচনায় তার দৈনন্দিন জীবনটাকে জর্জরিত করেছে বারবার। পুরুষতন্ত্র নারীকে সবচেয়ে বেশী আবদ্ধ রাখতে পেরেছে তার ধর্মশাস্ত্র দ্বারা। বারবার শিক্ষা দিয়ে এসেছে- 'গৃহধর্মই নারী জীবনের সারবস্তু। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে- নারী এই নিয়মটাকে নিঃশব্দে মেনে নিয়েছে, টু শব্দটি পর্যন্ত করেনি। ঐ অশিক্ষিত অবলা নারীদের একবারও মনে হয়নি এটা যে ওদের জন্য কতটা কঠিন শিকল। অনেকের ক্ষেত্রে নারীর সবচেয়ে বড় শত্রুরূপে দেখা যায় নারীকেই। একটি মেয়ে জন্ম নিলে চারদিকে পড়ে শোকের ছায়া, যেন কারোর মৃত্যু হয়েছে। সবাই নিন্দায় মুখর হয়ে উঠে। দেখা যায় এতে মহিলারাই বেশী অংশ নেয়। একটি মেয়ের জন্ম পিতৃত্বের জন্য বয়ে আনে চরম দুঃসংবাদ। পৃথিবীতে সে অনভিনন্দিত। তাকে যে কি অদম্য প্রাণ শক্তিকে অবলম্বন করে বাঁচতে হয় তা এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন রক্ষণশীল জুম্ম পিতৃ সমাজ কিভাবেই বা উপলব্ধি করবে?

নারীর সাথে ছোটবেলা থেকেই দুর্ব্যবহার শুরু করে প্রিয়জনেরা। চরম অবহেলার মধ্যে তাকে বড় হতে হয়। জীবনে কোন কিছুতেই সে উৎসাহ না পাওয়ায় গোড়াতেই সে তার আত্মবিশ্বাসটাকে হারিয়ে ফেলে। তার জগত ছোট হয়ে যায়। নারী হয়ে উঠে জীবন্ত পুতুল। বাতিল হয়ে যায় তার স্বাধীনতা। চারদিকে পুরুষাধিপত্য দেখে তার মানসিক শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলে সে পরিণত হয় শূন্য পাত্রে। এখনো নারী পুরুষের বিশুদ্ধ সাম্য পৃথিবীর কোথাও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এমনকি ভবিষ্যত নির্ধারণের অধিকারও সে পায়নি। আজও বেশীর ভাগেরই ধারণা বিয়ে ও সংসার হচ্ছে নারীর প্রধান পেশা। পিতৃতন্ত্র তাকে উৎসাহিত করে সুমাতা, সুগৃহিনী হতে। বলে এতেই নারী জীবনের সার্থকতা। অথচ এর চেয়ে যে ক্লান্তিকর, নির্জীব জীবন নেই তা যদি একবার নারী জাতি বুঝতে সক্ষম হতো?

৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

বিশ্ব নারী দিবস ও পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম নারী প্রসঙ্গ

বীর কুমার তংচঙ্গ্যা

জাতিসংঘ ৮মার্চ তারিখটি 'বিশ্বনারী দিবস' নামে ঘোষণা দিয়েছে। এই ঘোষণার ফলে মানবজাতির একাংশ নারীদের আত্মপরিচয় লাভের যেমন সুযোগ হয়েছে তেমনি বিভিন্ন উদ্যোগ আয়োজনের মাধ্যমে নারীদের আত্ম প্রতিষ্ঠা লাভেরও সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই এই ঘোষণার মাধ্যমে সামনে এগিয়েছে বলা অসঙ্গত হবে না।

কোন কোন দেশে বা কোন কোন সমাজে দেখা যায়, নারীরা খুবই অবহেলিত, নির্যাতিত এবং নিপীড়িত। তাদের প্রতি স্বামী, শ্বশুর-শ্বাশুরী, ননদ এবং দেবরের অন্যায় আচরণ নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। বিশ্বনারী দিবস উপলক্ষ্যে সীমিত পরিসরে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম নারীদের কথা প্রাসঙ্গিকভাবেই উত্থাপন করা যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম নারীগণ যদিও স্বামী, শ্বশুর-শ্বাশুরী, ননদ এবং দেবরের দ্বারা অন্যান্য কোন সমাজের নারীদের ন্যায় প্রকাশ্যভাবে নির্যাতিত ও নিপীড়িত নহে তথাপি পারিবারিক ও সামাজিকভাবে তাদের উপর প্রচ্ছন্ন নির্যাতন চলছে।

সাধারণভাবে দেখা যায়, একজন জুম্ম নারীকে স্বামী বা গৃহের অন্যান্যদের সঙ্গে সকালে ক্ষেতে কাজে যেতে হয়। এমনও হয় কাজে যাবার আগে তাকে রান্না বান্না বা অন্যান্য কাজে ব্যবহারের জন্য নদী বা জলাশয় থেকে পানি সংগ্রহ করে রেখে যেতে হয়। কাজ করতে করতে দুপুর বেলায় ঘরে এলে আবার রান্না বান্না করতে হয় সকলের জন্য। রান্না বান্নার পর সকলের আহার যুগিয়ে নিজে আহার করে এবং অন্যান্যদের সঙ্গে আবার কাজে চলে যায়। সন্ধ্যার সময়ও সেই একই রকমভাবে নদী বা জলাশয় থেকে পানি এবং জঙ্গল কিংবা ক্ষেত থেকে শাক-সব্জী, লতাপাতা সংগ্রহ এবং অনেক সময় জঙ্গল থেকে জ্বালানী কাঠও সংগ্রহ করে আনতে হয় তাকে। এই কাজে কোন পুরুষ অংশ নেয় না। একমাত্র গৃহবধু বা নারীকেই তা সম্পন্ন করতে হয়।

সকলের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করা, খাবার পানি, লাকড়ী, শাক-সব্জী, লতাপাতা সংগ্রহ করা এবং ক্ষেতে অন্যান্যদের সঙ্গে কাজ করা জুম্ম বধু বা নারীর জন্য অপরিহার্য। ইহা পারিবারিক এবং সামাজিক প্রচলিত বিধানই বলা চলে। পুরুষেরা শুধু ক্ষেতের কাজই করে। আর কাজ না থাকলে অবসর বুঝে ঘুরাফিরা করে। জুম্ম নারীরা এভাবে আয়েশ করে সময় নষ্ট করার অবকাশ পায় না।

কালের প্রবাহে বিভিন্ন কারণে জুম্ম জনগোষ্ঠীর জীবিকা নির্বাহের পদ্ধতিতে পরিবর্তন এসে গেছে। কাপ্তাই বাঁধের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিস্তীর্ণ এলাকার ধানীজমি জলমগ্ন হয়ে গেছে। আর পাহাড়ের মাটি ক্রমশঃ উর্বরতা হারিয়ে ফেলার কারণে জুম চাষের সুযোগ ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় যৌথ খামারে ফলের বাগান, কর্ণফুলী হ্রদ এলাকায় বাঁশ বাগান এবং ফলজ ও বনজ বাগান করে জুম চাষের বিকল্প পদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছে। কিন্তু এই পদ্ধতিতেও জুম্ম নারীদের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়নি। গৃহস্থালী ও গৃহের উভয় কাজ এই জীবন পদ্ধতিতেও তাদের সম্পন্ন করতে হয়। একটুও বদলায়নি।

জুম্ম জনগোষ্ঠীর নারীরা বর্তমানে উচ্চ শিক্ষা লাভ করে সরকারী, বেসরকারী চাকুরী গ্রহণসহ পুরুষদের সাথে একই পেশায় নিয়োজিত হয়েছে। এতে তারা অনেকটা স্বাবলম্বী হবার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু জুম্ম নারীরা পিতা-মাতার পুত্র সন্তানের বর্তমানে পিতা-মাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নহে। পিতামাতা স্বেচ্ছায় সম্পত্তি দান করলেই মেয়ে বা নারীরা সম্পত্তি লাভ করতে পারে। জুম্ম নারীদের এটা হচ্ছে তাদের জীবনের একটি নেতিবাচক দিক।

১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পর পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগোষ্ঠীর জীবনে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে বলা যায়। তবে 'আমূল পরিবর্তন' কথাটির অর্থ এই নয় যে, রাতারাতি তাদের অনগ্রসরতা, দারিদ্রতা, তাদের উপর শোষণ-বঞ্চনার অবসান হয়েছে। আগের তুলনায় বর্তমানে তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকারের স্বীকৃতি লাভ হয়েছে কাগজেপত্রে মাত্র। এইসব অধিকার নিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন সম্ভব হয়েছে মাত্র।

ইহার প্রেক্ষিতে পুরুষদের ন্যায় জুম্ম নারীদের সার্বিক অধিকারও সূচিত হয়েছে। কিন্তু ইহা মনে রাখতে হবে, প্রাকৃতিক নিয়মেই পুরুষেরা নারীদের উপর তাদের (পুরুষের) কর্তৃত্ব করতে দেয় না বা দেবে না। নিজেদের চেতনা, উদ্যোগ, অধ্যবসায় ও বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

যুগে যুগে পুরুষ নারীকে পদানত করে রাখতে চাইলেও পদানত রাখতে পারেনি। নারী তার প্রতিভা এবং আন্তরিক ক্ষমতার বলে পুরুষদের উপর বিজয় লাভ করেছে। পৃথিবীতে যুগে যুগে নারীর জন্য পুরুষ প্রাণ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে ততজন নারীর কোন পুরুষের জন্য প্রাণ যায়নি বা নারী প্রাণ দেয়নি। ইহা নারীর জন্য একটি ইতিবাচক দিক।

বিশ্ব ইতিহাসের পাতায় বহু মহিয়সী নারীর কথা লিপিবদ্ধ আছে, তা আমরা দেখতে পাই। ভাল-মন্দ গুণ নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে আছে। ইতিহাসে যতজন বিখ্যাত পুরুষের নাম লিপিবদ্ধ আছে, অনেক বিখ্যাত নারীর নামও গুরুত্ব সহকারে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। রাশিয়ার রাণী ক্যাথারিন দি গ্রেট, স্পেনের রাণী ইসাবেলা, মিশরের রাণী ক্লিওপেট্রা এবং ইংল্যান্ডের রাণী ভিক্টোরিয়া- এগুলো ভাল-মন্দের জীবনচিত্র হলেও নারীত্বের মহিমা এতে প্রতিফলিত থাকে, নয় কি?

অতি সম্প্রতিকালের কয়েকজন মহিয়সী নারী বিশ্বের নারীদের মর্যাদা কতটুকু বৃদ্ধি করেছেন তা ইতিহাস অধ্যয়ন করলে অনুধাবন করা যায়। ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী গোল্ডা মায়ার, ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা এবং আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন বেগম খালেদা জিয়া। তারা সবাই নারী জাতির গৌরব বর্ধন করেছেন। ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচারকে অনেকেই একজন যুগান্তকারী মহিলা বলে প্রশংসা করেন।

সুদীর্ঘকালের সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাশিয়াকে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করার মূলে এই বৃটিশ মহিলাকে দায়ী করেন। তিনি ক্রেমলিনে রাষ্ট্রীয় সফর করার পর কি বুদ্ধিমত্তা কিংবা মোহিণী শক্তিতে সোভিয়েতের প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্ভাচেভকে বশীভূত করেছিলেন কে জানে! 'পেরস্ত্রেইকা, গ্লাসনস্ত' - এই শ্লোগান তুলে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে পাশ্চাত্য ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করে মিখাইল গর্ভাচেভ, কার্ল মার্কসের শিষ্য সোভিয়েত সোশালিষ্ট রিপাবলিক এর প্রতিষ্ঠাতা লেনিনকে রাশিয়া থেকে বিসর্জন দিলে মার্গারেট থ্যাচারের এই বিস্ময়কর কাহিনী কারো অজানা নহে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের নারীরা এখনও বহুলাংশে অশিক্ষিত ও পশ্চাদপদ রয়েছে। তাদের জাতিসত্বাগত সহজ সরল স্বভাবের কারণে এখনো বিভিন্নভাবে প্রতারিত হচ্ছে। তাদের জন্মগত যে অধিকার সেই অধিকার থেকে সামাজিকভাবে বঞ্চিত হচ্ছে। সমাজের একাংশ নারীদের এইরকম দুরাবস্থার নিরসন করতে না পারলে জুম্ম সমাজের উন্নতি বা সমৃদ্ধি সুদুর পরাহত।

বিশ্বনারী দিবসে এইসব বিষয় গুরুত্ব সহকারে ভাবতে হবে। আমি এই পর্যায়ে উল্লেখ করতে চাই যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি, হিল উইমেন্স ফেডারেশন এবং বিভিন্ন মহিলা বিষয়ক ও অন্যান্য সংস্থাসমূহ জুম্ম নারীদের অধিকার সচেতন করার জন্য ইতিমধ্যে বিভিন্ন কর্মপন্থা গ্রহণ করেছে। তার কিছু কিছু লক্ষ্য করা যায়। এব্যাপারে জুম্ম জনগণের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। সর্বপ্রকার সহায়তা দানের মাধ্যমে নারী সংগঠনসমূহকে তাদের মহৎকাজে সাফল্য লাভের সুযোগ দিতে হবে।

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম নারীদের মধ্যে চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা নারীদের একাংশ, যারা কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করছে, তারা অতি আগ্রহসহকারে, অতি সহজে নিজেদের সংস্কৃতি বিসর্জন দিচ্ছে। স্বকীয় পোষাক পরিচ্ছদের প্রতি তাদের মর্যাদাবোধ আছে বলে মনে হয় না।

বিশ্বনারী দিবসে তাদের বুঝতে হবে যে, নিজেদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি লালন করতে না পারলে বা ধারণ করতে না পারলে তারা জাতিসংঘের ঘোষিত 'বিশ্ব নারী দিবস' এর সুফল ভোগ করতে পারবে না।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী সমাজ ব্যবস্থায় নারী

পারমিতা তঞ্চঙ্গ্যা

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীরা যুগে যুগে অধিকার বঞ্চিত ও সমাজে নারীরা এখনো পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে স্বীকৃত নয়। যদিও শিক্ষা-দীক্ষায় নারীরা পুরুষদের সমতালে এগিয়ে চলছে তারপরও সমাজে তাদের স্থান পুরুষদের তুলনায় অনেক নিচে। সমাজে এখনো এমন কিছু প্রথা বা সংস্কার টিকে আছে যা নারী পুরুষ বৈষম্যকে টিকিয়ে রেখেছে।

একটি শিশু জন্মের ক্ষেত্রেও দেখা যায়- মেয়ে শিশুর চেয়ে ছেলে শিশু অনেক বেশী আকাঙ্খা করা হয়। হয়তো শেষ বয়সে পুত্র সন্তানের ঘরে জীবন কাটানোর ইচ্ছা এর মুল কারণ হতে পারে। যদিও বর্তমানে অনেকে কন্যা সন্তানের ঘরে জীবনের শেষ দিনগুলি কাটাচ্ছেন, তারপরও সমাজে পুত্র সন্তানের ঘরে জীবনের শেষ দিনগুলো অতিবাহিত করার মধ্যে একটা সূক্ষ গর্ববোধ থাকে। অথচ পুত্র সন্তানের ঘরে যে আদর-যত্ন পাওয়া যায়, কন্যা সন্তানের ঘরেও তার চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী নারীরা যথেষ্ট স্বাবলম্বী। তারা পুরুষের সমতালে অফিস-আদালতে গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকুরী করছে, নিজস্ব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দেখাশুনা করছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও নারীরা গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন। বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কিংবা জনপ্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানেও আদিবাসী নারীরা এগিয়ে রয়েছে পুরুষদের সমানতালে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী নারীরা যদিও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যথেষ্ট স্বাবলম্বী তারপরও কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবারের পুরুষ সদস্যদের সিদ্ধান্তের উপরই তাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নির্ভর করে।

অতীতে জুম্ম সমাজে নারীর অবস্থান ছিল শ্রমিক হিসাবে। শ্বশুর বাড়ীতে গিয়ে সন্তান লালন পালন, সারা জীবন রান্না-বান্না, কাপড় বুনা, জুমে কাজ করা, ঘরে পানি তোলা, লাকড়ি সংগ্রহ করা ইত্যাদি সংসারের যাবতীয় কাজ করতে হতো। প্রকৃতপক্ষে নারীর নিজস্ব বলতে কিছু ছিল না। অতীতে নারীদের তুলনায় বর্তমান আদীবাসী নারী সমাজ অনেক সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। তার মূলে রয়েছে শিক্ষা। শিক্ষার ব্যাপক প্রসারতা আদিবাসী নারী সমাজকে সচেতন করে তুলেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী নারীদের শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন বাধা না থাকলেও দেখা যায় পুরুষদের সমপরিমাণ উচ্চ শিক্ষিত নারী এখনও গড়ে উঠেনি। এথেকে অনুমান করা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী সমাজেও নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই গলদ আছে। তাছাড়া একজন নারীকে লেখাপড়ার পাশাপাশি পারিবারিক কাজেও সময় দিতে হয়। কিন্তু একজন পুরুষকে তেমন দিতে হয় না। তাই প্রাতিষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং বাইরের জগতের জ্ঞান আহরণের সুযোগ পুরুষের তুলনায় নারীর কম। অতীতে নারীরা সন্তান লালন পালন, সংসারের যাবতীয় কাজ থেকে জুম চাষ, ফসল উৎপাদনের কাজও সামলিয়ে নিতে হয় চমৎকারভাবে। বর্তমান আদিবাসী নারীরাও তার ব্যতিক্রম নয়। বরং তার চেয়ে আরও অনেক বেশী গুরুদায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে নারীদের। সন্তানকে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে মানুষ করা, সংসারের জুতা সেলাই থেকে চন্ডীপাঠ পর্যন্ত সম্পন্ন করে চাকুরীর দায়িত্ব পালন করা, সর্বত্রই নারীকে সামলাতে হচ্ছে সুনিপুণভাবে। প্রকৃতপক্ষে বলা যায়, সামলাতে বাধ্য হচ্ছে। কেননা, নারীদের ছোটবেলা থেকেই মজ্জাগত করে দেওয়া হয় যে, 'সংসারের সবকিছু সুন্দরভাবে সামলিয়ে চলাই তোমার বড় কর্তব্য'।

সারা বিশ্বে যখন পুত্র সন্তানের পাশাপাশি কন্যা সন্তানেরও পিতার সম্পত্তির ন্যায্য অধিকারের কথা বলা হচ্ছে, তখন পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী নারীদের বেলায়ও পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হতে পারে যদি পিতার পুত্র সন্তান না থাকে। তাছাড়া পুত্র সন্তান থাকুক বা না থাকুক পিতা বা স্বামী দানসূত্রে উইল করে গেলেই পার্বত্য চট্টগ্রামের নারীরা সম্পত্তির অধিকারী হতে পারে। যা আদিবাসী নারীদের প্রতি অত্যন্ত অবহেলা এবং বৈষম্যের ব্যাপার। শ্রদ্ধেয় বঙ্কিমকৃষ্ণ দেওয়ান কর্তৃক রচিত 'চাকমা উত্তরাধিকার প্রথা' বইতে বলা হয়েছে 'সমাজের রক্ষণশীল মনোভাবই এর জন্য দায়ী। অসমবর্ণ এবং অসম ধর্মে বিবাহ ব্যাপারে যদিও কোন সামাজিক বিধি নিষেধ নেই, মনে হয় এ প্রকার ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রকারান্তরে তা নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। নতুবা স্থাবর কিংবা অস্থাবর সম্পত্তির উল্লেখযোগ্য একটা অংশ এতদিন সমাজের বাইরে সম্পূর্ণ ভিন্ন সম্প্রদায়ের দখলে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিত।' আদিবাসী নারীদের পিতৃসম্পত্তির অধিকারী না করার যে সব কারণ দেখানো হয়েছে তা শুভঙ্করের ফাঁকি বৈ কিছু নয়। যে নারী পরিবারের জন্য সারা জীবন খেতে যায়, যে কন্যার শরীরে পিতার রক্ত প্রবাহমান সে কেন স্বামী ও পিতার সম্পত্তির ন্যায্য উত্তরাধিকারী হতে পারবে না? কেন তাকে পিতা ও স্বামীর দানের উপর নির্ভর করতে হবে? বর্তমান যুগের প্রেক্ষাপটে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী সমাজে নারীদের পিতা ও স্বামীর ন্যায্য উত্তরাধিকারী করার আইন প্রণয়নের পদক্ষেপ নেয়া উচিত, যেন আদিবাসী নারীকে কারও দয়ার উপর নির্ভর করতে না হয়। পরিবারে নারীর মর্যাদা যেন অক্ষুন্ন থাকে এবং সমাজে সসম্মানে বিচরণ করতে পারে।

পরিশেষে বলতে চাই- নারী পুরুষের বৈষম্য বিষয়টা শুধু নারীদের বিষয় নয়। নারীরা পিছিয়ে থাকলে সমাজের অগ্রগতি সম্ভব নয়। জনসংখ্যার অর্ধেক নারী সমাজের অগ্রসরতায় নারীর অবদান সবচেয়ে বেশী। একজন পুরুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নারীর প্রয়োজনীয়তা ও অবদান অনস্বীকার্য। তাই আদিবাসী সমাজ ও পুরুষদের প্রতি আহ্বান- নারীকে শুধু নারী হিসেবে নয়, একজন মানুষ হিসেবে মূল্যায়ণ করুন। তাদের মতামতকে শ্রদ্ধা করুন। তাদের সম্মান করুন এবং তাদের ন্যায্য অধিকার দিন।

স্বাধীনতা নারীর জন্মগত অধিকার। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী সমাজে নারীদের স্বাধীনভাবে চলাফেরার কোন বাধা নেই। সুতরাং আদিবাসী নারীরা এগিয়ে আসুন আমরা স্বাধীনতাকে (স্বেচ্ছাচার নয়) কাজে লাগিয়ে শিক্ষায়, দক্ষতায়, স্বাবলম্বীতায় পুরুষদের পাশাপাশি এগিয়ে চলে বিশ্বের দরবারে নিজেদের স্থান নিশ্চিত করে তুলি। জাতিসংঘ ৮ মার্চকে বিশ্ব নারী দিবস ঘোষণা করে নারীত্বের যে জয় ঘোষণা করেছে, আমরা নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে সে ঘোষণাকে সার্থক করে তুলি।

---

৫ পৃষ্ঠার পর

জুম্ম সমাজে নারীর অবস্থান

সামাজিক রক্ষণশীলতার এই ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সমাজের প্রত্যেক নারীকে আরও সচেতন হতে হবে। বিশেষ করে আর্থ স্বাধীনতা করায়ত্বের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে বেশী করে। আমাদের সমাজ সাধারণতঃ নারীর আর্থ স্বাধীনতাকে কুটিল চোখে দেখে। তাই নারীর উচিত হবে সমাজের ঐ রাঙা চাহনীকে উপেক্ষা করে একটি পেশায় নিয়োজিত হওয়া, আর সেই পেশাটি অবশ্যই সংসার হবে না। নিজের ভবিষ্যতের জন্য নারীকে অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে পিতৃ ও পুরুষতন্ত্রের সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা, ছেড়ে দিতে হবে সুমাতা, সুগৃহিণীর ধারণা, তাকে করায়ত্ব করতে হবে শিক্ষা এবং গ্রহণ করতে হবে পেশা। তাকে হতে হবে অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন, স্বায়ত্বশাসিত। তাকে প্রস্তুত থাকতে হবে সব ধরনের প্রতিক্রিয়াশীলতার সাথে লড়াইয়ের জন্য। তাকে কান ফিরিয়ে নিতে হবে পুরুষতন্ত্রের সমস্ত মধুর বচন থেকে। কেননা কেউ তার মুক্তি চায় না। নারীকে আক্রমণাত্মক হয়ে নিজের ভবিষ্যত সৃষ্টি করতে হবে নিজেকেই, পুরুষ তার ভবিষ্যত সৃষ্টি করবে না। নারীর ভবিষ্যত সত্যিকারের মানুষ হওয়া, নারী হওয়া-নারী থাকা নয়।

শহীদের তালিকায় আরেকজন ভূবনমণি চাকমা

পলাশ খীসা

২রা ফেব্রুয়ারী ২০০২ সকাল ১০টার দিকে শ্যামল চাকমা একটা দু:সংবাদ দিল, "আপনার বন্ধু রূপালী ব্যাংকের অফিসার মিথুন চাকমা মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সকালে একটা ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাউসিয়া মার্কেটের সামনে ফুটপাতে দাড়িয়ে থাকা মিথুনকে ধাক্কা মেরেছে।" খবরটা শোনার পর পরই মিথুনকে দেখতে হাসপাতালে চলে গেলাম। হাসপাতালের জরুরী বিভাগে কর্তব্যরত নার্সদের কাছ থেকে জানতে পারলাম রোগীকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। সে পাহাড়ী নয়, হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক। সে আগে রূপালী ব্যাংকের অফিসার হিসেবে এখানে কর্মরত ছিল। বর্তমানে চট্টগ্রামে চাকুরী করে। বৃহস্পতিবার বাড়ীতে এসে সেদিন কর্মস্থলে চট্টগ্রামে যাওয়ার জন্য বিরতিহীন বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল। সেই সময়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

বেলা আড়াইটা। দুপুরের খাবার সবেমাত্র খাওয়া শেষ করেছি। ঠিক সেই সময়ে পিসিপির রাঙামাটি জেলার সাংগঠনিক সম্পাদক টুলু মারমা আরেকটি দুঃসংবাদ জানালো, "ঘাগড়ার ভূবনমণিকে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা গুলি করেছে। রাঙামাটি হাসপাতালে আনা হলে ডাক্তার তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। লাশটি এখনো হাসপাতালে আছে।" সাথে সাথে টুলুসহ আমরা হাসপাতালে গেলাম। বাইরে জনসংহতি সমিতির সহ সভাপতি উষাতন তালুকদার, পিসিপি নেতা সুমেত চাকমা, ডিসি, এসপিসহ অর্ধশতাধিক জেএসএস ও পিসিপি নেতা কর্মী সমর্থক সেখানে রয়েছেন। কারো মুখে তেমন কোন কথা নেই।

আমরা চলে গেলাম হাসপাতালের ভেতরে যেখানে বীর সহযোদ্ধার মৃতদেহটি রয়েছে। ভূবনমণির সাথে পরিচয় অনেক আগে থেকে। সংগঠনের একজন ত্যাগী আদর্শবান কর্মী হিসেবে তার ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল আমাদের। তার সাথে যখনই দেখা হতো তখনই সে নমস্কার দাদা বলে সম্বোধন করে শ্রদ্ধা জানাতো, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ব্যাপারে ভাববিনিময় করতো। অথচ সেদিন তাকে ঢেকে রাখা কালো পলিথিনটা সরিয়ে যখন তার সাথে দেখা হয় তখন সে আর নমস্কার জানাতে পারেনি। পারেনি মুখ ফুটে কিছু বলতে। বরং আমিই শ্রদ্ধা জানালাম তাকে। দেশ ও জাতির জন্য আজ তাকে প্রাণ দিতে হলো। অবিকল চেহারা নিয়ে নিথর দেহটা পড়ে আছে। সন্ত্রাসী হায়েনাদের আক্রমণের কোন চিহ্ন সামনের দিকে নেই। পিছন দিক থেকে গুলি করেছে সন্ত্রাসীরা। সামনে আসার সাহস ছিলো না।

এদিকে ভূবনমণিকে সন্ত্রাসীরা গুলি করেছে আর তাকে হাসপাতালে নেয়া হয়েছে এ খবর পেয়ে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার মধ্যে সময় কেটে যায় তার গর্ভধারিনী মা ভদ্রপতি চাকমাসহ পরিবারের অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের। উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মধ্যে যেন ঘড়ির কাটা ঘুরতে চাই না ভূবনমণি চাকমার প্রিয়তমা স্ত্রী রিমি চাকমার (২৬)। স্ত্রীর কাছে প্রিয়তম স্বামীর মৃত্যু নেই, হতে পারে না। তাইতো অপেক্ষায় থাকে রিমি। এই বুঝি খবর এলো - ভূবনমণির বিপদ কেটে গেছে, এখন সে আশঙ্কামুক্ত। ঘাতকের বুলেট তেমন কোন আঘাত করতে পারেনি। ভালোবেসে বিয়ে করেছিল তারা কয়েক বছর আগে। ভালোবাসার ফসল হিসেবে জন্ম নেয় তাদের পুত্র সন্তান রিমন চাকমা। যার বয়স এখনো ১০ মাস।

পোষ্ট মর্টেম শেষে ভূবনমণি চাকমার লাশটি নিয়ে যাওয়া হয় তার গ্রাম ঘাগড়ার চৌধুরী পাড়ায়। বাড়ীতে পৌছার সাথে সাথে গর্ভধারিনী মা, প্রিয়তমা স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন আর বন্ধুদের বুক ফাটা কান্নায় ভারী হয়ে যায় চৌধুরী পাড়ার আকাশ বাতাস। পাড়া প্রতিবেশীরা দলে দলে চলে আসে ভূবনমণিকে একনজর দেখতে, শ্রদ্ধা জানাতে। মা, দাদীসহ অন্যান্যদের কাঁদতে দেখে এবং অনেক লোকের সমাগম দেখে হাসোজ্জ্বল হয়ে উঠে অবুঝ শিশু রিমন। সে জানে না কি হয়েছে, কেন কাঁদছে তার মা-দাদী ও অন্যান্যরা। তার কাছে আনন্দ উৎসবের মতো মনে হচ্ছে বলেই সে হাসছে। চির জীবনের জন্য পিতৃস্নেহের কাছ থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয়েছে, কে বঞ্চিত করেছে - সে জানে না। বাবার নাম ভূবনমণি লিখবে অথচ বাবা বলে ডাকতে পারবে না - এসব কিছুই সে জানে না।

বাড়ীর কিছু দুরে বাঁশের ছায়ায় মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে ভাবছে ১৫ বছরের আরেক কিশোর চাইলাপ্রু মারমা। বৌদ্ধ বিহারে থেকে ঘাগড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে সে নবম শ্রেণীতে পড়ছে। তার বাবার নাম সুইথোয়াই মারমা। শান্তিবাহিনীতে থাকাকালীন সুইথোয়াই মারমার নাম ছিল মিলন। তার বাবাও একজন মুক্তিযোদ্ধা, পার্বত্য চট্টগ্রামের দুই যুগের সশস্ত্র সংগ্রামের একজন বীর যোদ্ধা।

১৯৯৭ সালে পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরের পর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসলে গত ২১/০৬/২০০১ তারিখে কাউখালীতে চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা তাকে গুলি করে হত্যা করে। চাইলাপ্রু বৌদ্ধ বিহারে থাকে। তাকে বই আর কাপড় চোপড়সহ স্কুলের কিছু টুকিটাকি খরচ দেয় পিসিপি ঘাগড়া শাখা। এভাবে নিদারুণ অভাব আর কষ্টে সে লেখাপড়া করছে। তার বুঝার বয়স হয়েছে। তাই সে ভাবছে তার বাবাকেও এভাবে গুলি করেছে সন্ত্রাসীরা। ১০ মাসের শিশু রিমন দুনিয়া সম্পর্কে কিছুই জানে না বলে মায়ের কান্না দেখেও তার হাসি থামছে না। সে জানে না তার বাবাকে চিরদিনের জন্য এই পৃথিবীর মায়া ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করেছে ঘাতকের বুলেট।

২রা ফেব্রুয়ারী ২০০২ প্রতি শনিবারের মতো সেদিন ভূবনমণি বাজারে আসে। শনিবার ঘাগড়া বাজার দিন। বাজারে আসার পর মানিকছড়ি গিয়ে সে ঘাগড়ায় ফিরে আসে বেলা ১টার দিকে। ফরেষ্ট চেক পোষ্টের দিক থেকে যখন সে চট্টগ্রাম-রাঙামাটি সড়ক ধরে বাড়ীর উদ্দেশ্যে বাড়ী যাচ্ছিল ঠিক সে সময়ে প্রসিত চক্রের সন্ত্রাসীরা দৌড়ে এসে পিছন দিক থেকে তাকে গুলি করে। ঘাতকের বুলেটের আঘাতে প্রাণ হারায় সে। এই অকাল মৃত্যুতে তার প্রেয়সী স্ত্রী রিমি হারিয়েছে তার প্রাণ প্রিয় স্বামীকে। গর্ভধারিনী ভদ্রপতি চাকমা তার হারিয়েছেন তার প্রিয় পুত্রকে। ১০ বছরের শিশু পুত্র রিমন হারিয়েছে জন্মদাতা পিতাকে। জন্মভূমি হারালো এক অতন্দ্র প্রহরীকে। আমরা হারালাম একজন সৎ, একনিষ্ট ও সাহসী যোদ্ধাকে। জাতি হারালো একজন অগ্রগামী সাহসী দেশপ্রেমিককে।

ভূবনমণিকে যেখানে গুলি করা হয়েছে সেখান থেকে তার বাড়ী খুব বেশী দুরে নয়। বাজারের মাঝখান দিয়ে দক্ষিণমুখী রাস্তা দিয়ে সামান্য গেলে পুর্ব দিকের পাহাড়ে স্বধর্ম বৌদ্ধ বিহার। বৌদ্ধ বিহারের উঠোন থেকে পশ্চিম-উত্তরে দেখা যায় পুরো বাজার, রাঙামাটি-চট্টগ্রাম মহাসড়ক এবং পূর্বদিকে পাহাড়টা নামলেই ছোট্ট পাহাড়ী নদী ঘাগড়া ছড়া। যা চৌধুরীছড়া গ্রামের মাঝখান দিয়ে ক্ষীণস্রোতে বয়ে গেছে। ছড়ার ওপাড়ে পাহাড়ের পাদদেশে ভূবনমণিদের বাড়ী। পাহাড় আর ছড়ার কোলে বেড়ে উঠা ভূবনমণি ছোট থাকতে হারিয়েছে বাবাকে। তারপরও সবকিছু ভুলে জন্মভূমি ও জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার দৃপ্ত শপথ নিয়ে সে পিসিপিতে যোগ দেয়। ছাত্র অবস্থায় ভালবেসে বিয়ে করে রিমিকে।

জন্মভূমি ও জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কাজ করার অপরাধে ঘাতকের হাতে তাকে জীবন দিতে হলো। কাউখালী উপজেলাধীন লেভাপাড়া গ্রামের মৃত রয়ধন চাকমার ছেলে রূপায়ণ চাকমা বর্তমানে একজন ইউপিডিএফ এর সক্রিয় সন্ত্রাসী। ইউপিডিএফ-এ যোগ না দেওয়ার আগে সে ছিল উচ্ছৃঙ্খল ও নৈতিক অধঃপতিত এক যুবক। ঘাগড়া বাজার এলাকার হেমন্ত চাকমা নামে একজনের কাছ থেকে সে একটি সাইকেল চুরি করেছিল। সাইকেল চুরির ঘটনা প্রমাণিত হওয়ায় শাস্তি হিসেবে সাইকেলটি ফেরৎ দেয়াসহ তাকে ১,২০০ টাকা জরিমানা করা হয়। সেই বিচারকার্যে ভূবনমণিও একজন সদস্য ছিল। জরিমানার টাকা ও সাইকেল ফেরৎ না দিয়ে সে ইউপিডিএফ এর সন্ত্রাসী কাজে যুক্ত হয়ে পড়ে এবং সেদিন দিন দুপুরে ভূবনমণিকে গুলি করে হত্যা করে।

বিগত ৯ ডিসেম্বর'৯৯ ইং প্রসিত চক্রের পিসিপি-র তৎকালীন কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি ও বর্তমান সভাপতি মিল্টন চাকমা এবং লোকজ্যোতি চাকমা চুক্তি বিরোধী গোপনীয় কাজ করতে এসে ধরা পড়ে ঘাগড়াতে। পিসিপি-র কর্মীরাই তাদেরকে ধরে ফেলে। ১৪ই ডিসেম্বর তাদের অভিভাবকের হাতে তাদেরকে তুলে দেওয়া হয় ভবিষ্যতে চুক্তি বিরোধী কার্যকলাপে জড়িত না হওয়ার শর্তে। তার অনেক আগে থেকে প্রসিত বিরোধীরা হত্যার রাজনীতি শুরু করেছিল। ফলে সেই সময়ে মিল্টন ও লোকজ্যোতির জীবিত অবস্থায় ফেরত পাওয়ার আশা ছিল না তাদের অভিভাবকদের। মিল্টনও ব্যক্তিগতভাবে আশা করেনি সে বাঁচবে। তারপরও তাঁরা ছাড়া পেলো। এক্ষেত্রে ভূবনমণিসহ বেশকয়েক জন সিনিয়র নেতার অবদান সবচাইতে বেশী। ভুবন মণি জীবনের ঝুঁকি নিয়েই তাদেরকে ছাড়ানোর ব্যবস্থা করে থাকে। অথচ সেই ভুবনমনিকে তাদের হাতে জীবন দিতে হলো। এর থেকে নির্মমতা আর কি থাকতে পারে? ভূবনমণির রক্তের দাগ শুকাতে না শুকাতে ৫ ফেব্রুয়ারী তারিখে মহালছড়ি বাজারে গুলি করে হত্যা করা

হয় রূপায়ণ খীসাকে। রূপায়ণ ইউপিডিএফ এর একজন সক্রিয় সদস্য এবং ইউপিডিএফ নেতা দীপায়ন খীসার আপন ছোট ভাই। কি কারণে তাকে হত্যা করা হয় তা স্পষ্ট নয়। তবে বেশ কিছুদিন ধরে তাদের মধ্যে মতানৈক্য চলছিল বলে খবর পাওয়া গেছে। বিশেষ করে জেএসএস ও পিসিপি সদস্যদের হত্যা, অপহরণ, গুম ও মুক্তিপণ আদায়ের পক্ষে বিপক্ষে তাদের মতপার্থক্য চরম পর্যায়ে বলে বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেছে। ইতিমধ্যে খাগড়াছড়ির গিরিফুল এলাকায় তাদের মধ্যে খন্ড খন্ড সংঘর্ষও হয়েছে বলে এলাকাবাসী জানিয়েছে। যেকোন মুহূর্তে তাদের মধ্যে আবারও রক্তক্ষয়ী আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ হতে পারে বলে মন্তব্য করেছে তাদের কেউ কেউ। আভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণেও তাকে হত্যা করা হয়েছে বলে অনেকে মন্তব্য করেন। আবার অনেকে বলে থাকেন যে একজন বাঙালী তাকে গুলি করে হত্যা করেছে। এটা সত্যও হতে পারে এ কারণে যে, রূপায়ণ বিভিন্ন সময়ে মাতাল অবস্থায় সেখানকার বাঙালীদের হয়রানি করেছে, বাঙালী ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মোটা অংকের চাঁদা নিয়েছে। ফলে ক্ষোভের বশবর্তী হয়ে প্রতিশোধ হিসেবে এ কাজ বাঙালীদের কেউ করতেও পারে।

পিসিপি বিভক্ত হওয়ার আগে ও পরে রূপায়ণ খীসা ছিল পিসিপি মহালছড়ি শাখার সাধারণ সম্পাদক। সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করলেও সে ছিল চরম নেশাখোর। প্রায় সময় মদ খেয়ে মাতাল অবস্থায় থাকতো সে। পিসিপির মাসিক চাঁদা তুলে সেই টাকায় মদ খেতো সে। পিসিপি বিভক্ত হওয়ার পরে বেশ কিছুদিন সে প্রসিত চক্রের সাথে কাজ করে। পরবর্তীতে সে চুক্তি পক্ষের পিসিপির মূল ধারার সাথে সংহতি জানায় এবং সেসময়ে সিঙ্গিনালায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে সে বক্তব্য রাখে। ১৯৯৭ সালে অনুষ্ঠিত ইউপি নির্বাচনে মেম্বার পদপ্রার্থী হওয়ার জন্য জেএসএস এর কাছে আবেদন জানায়। জেএসএস এর পক্ষ থেকে তাকে সমর্থন দেওয়ার আশ্বাস দেয়া হয়। যাতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে ক্ষতি না করে সে বাঁচার একটা পথ খুঁজে পায়। বিধি অনুযায়ী সে নোমিনেশন পেপার জমা দেয়। কিন্তু বাছাইয়ের সময় তার নোমিনেশন পেপার বাতিল করে দেয়া হয়। তার ভোটার নং ছিল ১৫৬ অথচ নোমিনেশন পেপারে দেয়া ছিল ১৫৫। আমি আমার বন্ধু জুয়েল খীসার বিবাহ অনুষ্ঠানে (৭ নভেম্বর '৯৭) যোগ দেওয়ার জন্য ৫ নভেম্বর '৯৭ তারিখে মহালছড়িতে আসি। গাড়ী থেকে নেমেই রূপায়ণের সাথে দেখা। সে তখন মাতাল অবস্থায় ছিল। আমাকে ষ্টেশনের পাশে চা দোকানে নিয়ে যায় এবং কান্না জড়িত কণ্ঠে বলে, চক্রান্ত করে তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তার নোমিনেশন পেপার বাতিল করে দিয়েছে। নোমিনেশন পেপার জমা দেওয়ার সময় সে ভালো করে তার ভোটার নং ১৫৬ লিখেছে। কিন্তু এটা তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ১৫৫ বানিয়ে দিয়েছে।

সে সাহায্য করতে হবে বলে আমাকে অনুরোধ করলো। তাই পরের দিন যেন আমি তার সাথে তৎকালীন জেএসএস এর এরিয়া কমান্ডার কুশলবাবুর সাথে দেখা করে বিস্তারিত বলে দিই। আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম যে, এটা একটা সাধারণ ব্যাপার। তাই সেখানে নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই। চিঠি লিখলেও চলবে। আমি একটা চিঠি লিখে দিলাম। জুয়েলের বিয়ের অনুষ্ঠানের পর আমি ঢাকায় চলে আসি। পরে জেনেছি রূপায়ণ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইউপি মেম্বার নির্বাচিত হয়েছে। চুক্তির পর অস্ত্র জমা দেওয়ার পর পরই সে আবার চুক্তিবিরোধীদের সাথে হাত মেলায়। তারই নেতৃত্বে ৮/০২/৯৯ তারিখে মহালছড়িতে উৎপল চাকমাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ৮/৬/২০০০ তারিখে রসময় চাকমাকেও মহালছড়িতে গুলি করা হলে সে মারাত্মকভাবে আহত হয় এবং তার ৭ মাসের শিশু সন্তান উজ্জ্বল চাকমাকে হত্যা করে। যেদিন রূপায়ণকে হত্যা করা হয়েছে সেদিনও তার কাছে একটি অস্ত্র পেয়েছে পুলিশ। অস্ত্র এমন একটা জিনিস যা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হলে অবশ্যই সঠিক মানুষের হাতে থাকা চায়। একটা চাকুর ব্যবহারের দুটো দিক বিশ্লেষণ করলে সেটা আরও স্পষ্ট হয়ে যাবে। একটি চাকু যদি কোন ডাক্তারকে দেয়া হয় তাহলে তা মানুষের কল্যাণে লাগবে। অর্থাৎ মানুষের চিকিৎসার কাজে সে ব্যবহার করবে। আর যদি একজন কসাইকে দেওয়া হয় তাহলে সে প্রাণী জবাই করার কাজে ব্যবহার করবে।

তাই প্রসিতবাবুর প্রতি অনুরোধ, আপনাদের অস্ত্র যার তার হাতে তুলে দেবেন না। চোর, মাতাল কিংবা ডাকাতের হাতে তুলে দিলে ভুবনমণি, সুবীর ওস্তাদ কিংবা তার্জেন এর মতো দেশপ্রেমিক সাহসী যোদ্ধাদের হারাতে হবে। চোর, মাতাল এদের মতিগতি ঠিক নেই। তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিলে সে অস্ত্র আপনাদেরও আঘাত হানবে একদিন। জুম্ম জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে চোর, মাতালদের হাত থেকে অস্ত্রগুলো কেড়ে নিন।

Introducing English as a Common Language of Hill People in Chittagong Hill Tracts

S. Chakma Suhrid

Having been asked to contribute on a time-befitting issue of Chittagong Hill Tracts, I have been hunting for a theme drastically for a couple of days. But I could not define a suitable one. The duration I was given to prepare the said article is about to be over whereas I am yet to settle such a topic. I have been burning with indecision for not lack of topic other than opting for a much-felt one. There are a great number of plots for articles before me. None of them is less significant. Consequently, it is rather difficult for me to find out a proper topic at the moment.

Chittagong Hill Tracts is a problem-stricken region. Men of different status namely students, teachers, businessmen, politicians, intellectuals, lawyers, workers, however, are undergoing problems and trying to have access to a decent outcome through discussion, motivation, campaign and by other means of expression. Seminar, meeting, symposium, debate etc. are being held by different quarters in the civil society concerning Chittagong Hill Tracts. Many of them are even availing themselves of the opportunity to have Ph. D. Degree on CHT-related research work. Most of the individuals and quarters, of course, in the emphasis on political situation. But it is not to be supposed that the socio-economic condition of Chittagong Hill Tracts is ignored. Also many articles and books were published based on natural resources and prospects of the region. If the development plans and initiatives adopted here so far are reviewed, it may be obvious that the development packages, which were brought by passing hill people and their expectation, were proved ineffective and unsustainable. Past experiences of development initiatives show that no development effort in Chittagong Hill Tracts is fruitful until and unless it is pro-people. The Chittagong Hill Tracts Development Board in collaboration with numerous donor and funding agencies designed and lastly implemented a large number of projects aiming at improving the way of life of local people. In the same way and purpose, some other institutions also did so. Nevertheless, local people, for whom the projects were, did not seem to be benefited in a true sense. Those days are no more. The background of Chittagong Hill Tracts has been changed to some extent after the Chittagong Hill Tracts Accord, 1997 being formally signed between GOB and PCJSS. Hence, everything is to be assumed in consistency with the converted surroundings.

It is an outstanding fact that the topography, flora and fauna, regular norms and life-style of Chittagong Hill Tracts as a whole are as different as administrative system from other parts of the country. This contrast has been in existence since time

immemorial. Similarly, socio-economic condition and overall way of living are of a distinguished characteristics. Having a land area of 5,093 square miles, Chittagong Hill Tracts is the ancestral abode of 11 different ethnic ethnic groups - Chakma, Marma, Tripura, Tanchangya, Lusai, Pankho, Mro, Bawm, Khumi, Chak and Khiyang. It is a matter of great astonishment that a language of particular ethnic group is not comprehensible to another one. They have to depend on either standard Bangla or Chittagonian vernacular to communicate with each other. Eventually, this difference of language remains as an obstacle in case of shaping inter-community relationship that must not be neglected. Because there is a unity in variety of them and that is the culture and socio=economic lifestyle resulted from living in the hills and on Jum Cultivation, a common productive system. And there grew the Jumma Nationalism up based on this culture, lifestyle and productive system that went a long way to stand in the attitude of restoration of their existence with cultural and ethnic identity. This mutual relationship would be firmer if there had been a common language as a means of inter-communication for 11 ethnic groups. As I said earlier, they use Bangla not only in case of making a conversation but also in case of correspondence. It has both its merit and demerit. The prime complexity is that in spite of being the state language Bangla is not the mother tongue for any of the communities living in Chittagong Hill Tracts. It cannot be over stated that communication in a language other than mother tongue may not cause inconvenience for a certain person but it is much troublesome for mass people especially people living in grass root level.

I think the subject "Primary education through mother toungue" was added to the existing subjects in the Rangamati/ Khagrachari/ Bandarban Hill District Council (amendment) Act, 1998 keeping this drawback of learning in mind. It is, in deed, praiseworthy. In this context what I want to mean is children will learn through mother toungue. There should also be a common language that will lead them to an inter-community unity. We should choose such a language by learning which we will be able to gain a greater achievement. In this case, I believe that it will be wise to opt for English. Its immediate advantage is that English is not a language of a particular nation or state. It is simultaneously used with vast popularity all over the world and recognised as international means of communication. Learning English will pave the children the way to enter the profound realm of knowledge and will get them acquainted with advanced culture as well as civilisation at home and abroad. They will be able to adjust to progress.

In addition to this, most of the research work and publication of higher education were conducted in English. Multi-cultured country India has already made much headway in various fields accepting English as a national and state language. Indian citizens are attaining success in different faculties of their intellect. They are coming first in international arena even in cultivating literary work in English. Ms Arundhuti Roy who got a hold of "Booker Award" recently is a citable example in this respect. There lies another important factor of increasing necessity of learning English all over the world and that is the concept of globalisation. This language is likely to be spoken by most of the people around the world for the sake of commerce or establishing supremacy among the world nations in near future as United States of America is trying to do at present. Free market or open economy whatever it is called is out of this trend. The availability of technology especially information revolution is gearing it up. Now the entire world is considered to be a global village.

In this age of globalisation and various forms of polarisation, it is a crying need to introduce English in Chittagong Hill Tracts as a common language of hill people. I am in a strong optimism that this initiative will bring about a new dimension in the existing self-rule system. It is to bear in mind that it will take a long time to be completely effective. Privileges may not be achieved overnight. The effort should be designed centring round the new generation of Jumma people. That is to say, it is the coming generation who will enjoy the advantages.

This is to be mentioned here that introducing English language does not mean excluding or neglecting Bangla. As Bangla is taught and used all spheres in the country, it is believed that Bangla will not be interfered at all on account of introducing English. Learning English stands for a greater plus point for hill people. Long ago, it was taught as a compulsory subject upto higher class of academy in our country. In the meantime, it was made optional one aiming at introducing Bangla all spheres in the country. It is true that doing this, we are able to glorify and establish Bangla to a great extent but at the same time we had an irreparable loss, for which we have to suffer severely every moment. We could not keep pace properly with the changing world for lack of English proficiency. It has been, of course, made compulsory again. But it is too late and the loss is yet to be met. Now English is a panic itself for most of the students except those who are taught in English medium schools and colleges or some aristocratic educational institutions in the country. A large number of students fail in the board exams every year. One of the root cause of their failure is nothing but English. One cannot think of taking higher education and competitive tests in abroad without having an excellent command of English. Apart from this, there is also an acute crisis of efficient teachers due to a long pause of learning English. Skilled teachers qualifying to teach English are rarely found.

However, the task of introducing English as a common language in this region will not be so uncomplicated. It is a time factor but is a must in the current global ground and above all in the effort of strengthening the inter-community unity and solidarity of different ethnic groups in Chittagong Hill Tracts. The Hill District Councils are to play the key role to put the proposed idea into action and all professionals have to come forward to make the effort successful side by side. There is an immense challenge of surviving hill people in Chittagong Hill Tracts with dignity and cultural distinctiveness. They have to be equipped with various prerequisites as well as qualifications to face the challenge. It is relevant to note that hill people have a glorious tradition of struggle against oppression and injustice. A common language of international prestige will be supportive in creating awareness and integrity among them. It will accelerate their spirit, broaden their outlook and the initiative, in the long run, will be a followable instance for all multilingual ethnic groups scattered across the globe.

প্রসঙ্গ পর্যটন

সুদীর্ঘ চাকমা

নৈসর্গিক লীলাভুমি পার্বত্য চট্টগ্রাম। প্রকৃতির নিপুণতায় নয়নাভিরাম নদী, পাহাড়, ঝর্ণা, সবুজ বনাঞ্চল সাথে বিভিন্ন ভাষাভাষি স্বতন্ত্র সংস্কৃতির আদিবাসী জনগণ। প্রকৃতির মতই সহজ সরল তাদের জীবন। ভরা ফসলের জুম ক্ষেত ভরিয়ে দেয় পাহাড়ী নর-নারীর হৃদয়। এক জুমে চাষ হয় অনেক প্রজাতির ফসল, যেন একটা বাজার।

ইংরেজরা এই জায়গার নাম দিয়েছিল কার্পাস মহল। কার্পাসের মাধ্যমে কর দিতে হতো ইংরেজকে। ইংরেজরা যায় যায় কালে রেড ক্লীপের দেশ বিভাগের অপারেশনে পার্বত্য চট্টগ্রাম অর্ন্তভুক্ত হয় পাকিস্তনে। যদিও বহু জাতির সন্নিবেশ ঘটেছিল ভারতের সার্বভৌমত্বে। পাহাড়ীরা মেনে নিতে পারেনি এই দেশ বিভক্তি। মেনে নিতে না পারার অপরাধে পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী। ১৯৬০ সালে ৫৪ হাজার একর ধান্যজমি পানির নিচে তলিয়ে দিয়ে, হাজার হাজার পাহাড়ী মানুষকে উদ্বাস্তু বানিয়ে নির্মাণ করে কাপ্তাই বাঁধ। অসহায় পাহাড়ী মানুষের চোখের অশ্রুতে ভরে উঠে কাপ্তাই হ্রদ।

কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ প্রকল্পের উৎপাদিত বিদ্যুৎ উদ্বাস্তু হওয়া জুম্মদের বাড়ী পৌঁছেনা। কাপ্তাই এর বিদ্যুৎ আলোকিত করে শহরকে, শহরবাসীকে। উদ্বাস্তু পাহাড়ীরা থাকে অন্ধকারে। ফলে তাদের হাসি-কান্না দেখেনা কেউ। সহজ সরল জুম্মদের এত বড় শাস্তি দিয়েও শাসকের মন ভরে না। শাসকের পরিবর্তন হয়, পরিবর্তন হয়না পাহাড়ী মানুষের জীবন ধারা। নতুন শাসকেরাও ধ্বংস করে দিতে চাই পাহাড়ীদের। মাটি তাদের প্রয়োজন, পাহাড়ীদের নয়। স্বপ্নে বিভোর মানুষ স্বপ্নহীন হয়ে যায়।

গড়ে উঠে প্রতিরোধ সংগ্রাম। কত মানুষের রক্ত, জীবন ঝরে পড়ে অকালে। নতুন করে আত্মমর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখে পাহাড়ীরা। জুম্ম নারীর আত্মচিৎকারে, মুক্তির আকাঙ্খায় সরল মানুষ প্রতিবাদী হয়ে অস্ত্র ধরে। শান্তির প্রত্যাশায় সুখী সমৃদ্ধশালী একটি দেশ গঠনের লক্ষে অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তির সুবাতাস পরিবাহিতের জন্য সাহসী মানুষেরা অস্ত্র পরিত্যাগ করে চুক্তির মাধ্যমে চলে আসে স্বাভাবিক জীবনে।

প্রকৃতি এবং কৃত্রিমতায় মিশ্রণে এক সৌন্দর্যের শহর রাঙ্গামাটি। অন্য দিকে খাগড়াছড়ি, বান্দরবানও প্রকৃতির সৌন্দর্যে অপরূপে অপরূপা। সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য্য বিভিন্ন ভাষাভাষি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আদিবাসী জনগোষ্ঠী। যারা প্রকৃতির সাথে মিলে মিশে বংশ পরম্পরায় বেঁচে আছে।

ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর পার্বত্য চট্টগ্রামে চোখে পড়ার মতো দেশী- বিদেশী পর্যটক দেখা যায়। সরকার বিদেশীদের পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশের ক্ষেত্রে কিছুটা শিথিলতা প্রদান করে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম দেশী-বিদেশী অনেক পর্যটকের কাছে আর্কষণীয় এক স্থানে পরিণত হয়। পর্যটনকে একটি শিল্প হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। এই শিল্পের সাথে বিভিন্ন মানুষের জীবন, জীবিকা জড়িত। চুক্তি পরবর্তী সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে পর্যটন নগরী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সরকার ও বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেয়া হয়। পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য উন্নত রাস্তাঘাট, হোটেল, রেস্টহাউজ ও তাদের মনোরঞ্জনের জন্য প্রয়োজনীয় আয়োজনের পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন সংস্থা পার্বত্য চট্টগ্রামকে কৃষি নির্ভর অর্থনীতির অঞ্চল হিসেবে উল্লেখ করলেও অত্রাঞ্চলে উন্নয়নের ক্ষেত্রে শুধু পর্যটন শিল্পকেই গুরুত্বারোপ করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের পক্ষ থেকে দাবী করা হয়েছিল যে, দীর্ঘদিন রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে হাজার হাজার পরিবার দুর্বিষহ জীবন যাপন করছে এবং এখনও পর্যন্ত অনেকেই নিজ ভিটে মাটিতে ফিরে যেতে পারেনি। ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী ও রাজনৈতিক কারণে উদ্বাস্তুদের যথাযথ পুনর্বাসনের জন্য আগে পরিকল্পনা নিয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার এবং তা অত্যন্ত জরুরী। কিন্তু সরকার তা না করে রাস্তাঘাট নির্মাণ সহ পর্যটন শিল্পের জন্য কোটি কোটি টাকা বরাদ্ধের আয়োজন করে। শুধুমাত্র পথঘাট তৈরী বড় বড় বিল্ডিং নির্মাণ করাকেই সরকার উন্নয়ন বলে চালিয়ে দিতে চায়। প্রকৃত অর্থে জনগণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অনগ্রসর রেখে প্রকৃত উন্নয়ন হতে পারেনা।

পার্বত্য চুক্তির পর যখন বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের কর্মসূচী সম্প্রসারিত করে তখন অনেকেই মন্তব্য করেছেন যে, এ অঞ্চলে উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতি আরো বিরূপ। বিভিন্ন সুবিধার পাশাপাশি ক্ষুদ্র ঋনের সুবিধার কারণে পার্বত্যবাসী আজ নিঃস্ব। ঠিক তেমনি পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে পর্যটন নগরী হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনাকেও অনেকেই সাধুবাদ দিয়ে থাকেন, আশীর্বাদ হিসেবে গণ্য করেন। এটাও পার্বত্যবাসীর জন্য এক অভিশাপ তা সন্দেহাতীত ভাবেই বলা যায়।বাস্তবে আমরা দেখতে পাই বিশ্বের যে সকল দেশে পর্যটন শিল্পের সম্প্রচার ঘটেছে সেখানে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক জীবন চরম অবনতির দিকে ধাবিত হয়েছে। সে অঞ্চলের জনগনের সংস্কৃতি ধ্বংস হয়েছে। নারীরা চরম নিপীড়ন ও অপমানের শিকার হয়েছেন। পর্যটন শিল্পের কেন্দ্র বিন্দু হল বা Hospitaliti Girls বা মনোরঞ্জক মহিলা। পর্যটন শিল্পের অন্যতম দেশ থাইল্যান্ডে নারীত্বের যে অপমান সতিই সে দেশের মানুষকে মাথা নিচু করে দেয়। থাইল্যান্ডের রোজী ট্রাভেল কোম্পানির একটি বিজ্ঞাপনে পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য লেখা হয়েছে-'' বিদেশীদের কাছে থাইল্যান্ড এক আকর্ষনীয় দেশ। বিশেষ করে একথাটা খাটে মহিলা সংক্রান্ত বিষয়ে। কিন্তু অনেক সময় বিদেশীরা এসে সমস্যায় পড়েন, বুঝতে পারেন না কোথায় গেলে এ অনাস্বাধিত আনন্দের খোঁজ পাওয়া যাবে। আমাদের রোজী কোম্পানি তাঁদের এই সমস্যার সমাধান মেটাচ্ছে। ইতিহাসে এই প্রথম আপনি এই সুযোগ পাচ্ছেন। আমাদের এই বইতে যে তালিকা দেয়া আছে সেটা দেখুন এবং থাইল্যান্ডে অনাস্বাধিত আনন্দ ভোগের জন্য টিকিট বুক করুন।'' বিশ বছর বয়সি থাই মহিলা নৈ এক স্বাক্ষাৎকারে বলেছিলেন-আমি যে ব্যাটারি কোম্পানিতে কাজ করি, তা থেকে যা পাই তা দিয়ে চলে না। খাওয়া, বাসের টিকিট ও অবশ্য প্রয়োজনীয় খরচ এতে একেবারেই মেটেনা। আমি খুব হিসাব করেই খরচ করি তাই আমাকে রাতেও কাজ(!) করতে হয়, আমাকে বাবা-মার জন্য কিছু অর্থ তো পাঠাতেই হবে। ফিলিপাইনে সরকারি হিসাব মতে এক লক্ষ এই মনোরঞ্জক মহিলা রয়েছে। বেসরকারি হিসাবে আরো বেশি। নাইট ক্লাবে বিদেশীরা তাদের জন্য মনোরঞ্জক মহিলা নির্বাচিত করেন। গড়ে ভাড়া ৬০ ডলার, নিস্পেষিতা মহিলাটি পান মাত্র ৬ ডলার। ৫৪ ডলার যায় দালাল ও সরকারের পেটে। দক্ষিণ কোরিয়ার পতিতাদের নাম ''কিয়াসায়েঙ''। তারা তাদের দেহ নিংড়ে প্রতি বছর সরকারকে ২৭ কোটি ডলার মুনাফা অর্জন করে দেয়। সেখানে আছে ''কিয়াসায়েঙ রেষ্টুরেন্ট''। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতের গোয়ায় ১৯৭৬ সালে মার্কিন বহুজাতিক সংস্থা ফাইভ স্টার হোটেল গড়ে তোলে। ১৯৮৭ সালের ৩০ মে গোয়া পূর্ণ রাজ্য হলে জুলাই মাসের নতুন সরকার ঘোষণা দিল যে, ট্যুরিজম হল গোয়ার মূল শিল্প। সরকার আইন করলো যে, হোটেলের জন্য জমি চাইলে অবশ্যই বিক্রি করতে হবে। জমির মালিকের ইচ্ছা অনিচ্ছা মূল্যহীন। স্থানীয় জনসাধারণ উৎখাত হতে বাধ্য হল নব্য ও বিকৃত শকুনের থাবার কারণে। তেমনি ভাবে মিশরে পর্যটন শিল্পের কারণে করুণ অবস্থা। মেক্সিকোতে পর্যটনের জন্য প্রমোদ হোটেল নির্মাণার্থে মাইলের পর মাইল বন কেটে উজাড় করা হয়েছে। (তথ্য সমূহ-সর্বগ্রাসী অক্টোপাস, অন্যচোখে পরিষদ)

US News and world report -এ বলা হয়েছে আমেরিকাতে যে পরিমান গম উৎপন্ন হচ্ছে তা দিয়ে সারা বিশ্বে প্রতিদিন প্রতিটি মানুষকে সাতটি করে মোটা সাইজের রুটি খাওয়ানো যায়। বিশ্ব ব্যাংকের রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের মানুষ যে পরিমান খাদ্য উৎপাদন করে তা দিয়ে প্রতিটি মানুষকে ২০৩৪ ক্যালরী খাবার সরবরাহ করা যায়। কিন্তু মানুষ পাচ্ছে মাত্র ১৫০০ ক্যালরী। বাংলাদেশে চাষযোগ্য জমি রয়েছে ২কোটি ২৪লক্ষ একর। উক্ত জমিতে চাষ করে ১৩কোটি মানুষের অন্ন যোগানো কোন ব্যাপারই নয়। সমাজে গুটিকয়েক মানুষ সর্বত্রই কৃত্রিম সংকট তৈরী করে রেখেছে। একদিকে মানুষের দারিদ্রতার সুযোগ নিয়ে গরীব মানুষের নৈতিক চরিত্রকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য দেশী-বিদেশী শোষকেরা সূক্ষভাবে পরিকল্পনা গ্রহত করে থাকে। পর্যটনও সেরকম একটি পরিকল্পনা। মানুণের শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান ইত্যাদি নাগরিক সুবিধাদি নেই অন্যদিকে কোটি কোটি টাকা খরচ করে বিলাসবহুল পর্যটন কমপ্লেক্স তৈরী হচ্ছে। গরীব মানুষের কুঁড়ে ঘরের আঙিনায় তারা ''পাঁচতারা'' হোটেল বানাবে আর গরীব মানুষের বেঁচে থাকার সমস্ত পথ রুদ্ধ করে দিয়ে বাধ্য করবে তাদের পাঁচতারা হোটেলে পয়সাওয়ালাদের আনন্দ উল্লাসের সামগ্রী হতে। তীব্র পেটের ক্ষুধায়,

আর্থিক সংকটে যখন কোন তরুণী, গৃহিণী তার ভাইকে, বাবাকে, পরিবারের সদস্যদের অভাবের জ্বালায় ছটফট করতে দেখবে তা সহ্য করতে না পেরে বাধ্য হয়ে দেহ বিক্রি করতে বাধ্য হবে ঐ সাজানো বিলাসবহুল অট্টালিকায়। মানুষের দারিদ্রতার সুযোগ নিয়েই তারা এসব অনৈতিক কাজ করতে চায়। সিলেটের মৌলভী বাজারে মাধবকুন্ডে ৪০টির মত খাসিয়া গ্রামে ১৫ হাজার খাসিয়া অধ্যুষিত এলাকায় সরকার "ইকোপার্ক" তৈরীর মাধ্যমে আদিবাসীদের চিড়িয়াখানার জন্তু বানাতে চায়। ঢাকায় আদিবাসী পল্লী গড়ার পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে শাসকের চরিত্র ফুটে উঠে। তারা ঐ আদিবাসী পল্লীতে বিভিন্ন আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর লোক এনে রাখবে আর তাদের দেখতে আসবে দেশী-বিদেশী কত পর্যটক। মানুষকে দিয়ে মুনাফার স্বার্থে তারা ব্যবসা করে আর মানুষের চরিত্রকে নষ্ট করে দেয়- যাতে মানুষ প্রতিবাদহীন নির্জীব প্রাণীতে পরিণত হয়।

সাম্রাজ্যবাদীদের থাবায় আজ সারা বিশ্ব আক্রান্ত। সাথে যোগ দিয়েছে বিভিন্ন দেশের দেশীয় লুটেরা গোষ্ঠী। অসহায় মানুষের জীবন নিয়ে তারা ব্যবসা করে। মুনাফা কামায় করে।বিশ্বে যে সকল দেশে অন্যায়, নিপীড়ন সংঘঠিত হচ্ছে সেখানেই রয়েছে দেশী-বিদেশী পুঁজিপতিদের কালো থাবা। দেশে দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরী, মানুষকে চারিত্রিক অধঃপতনে নামিয়ে দিয়ে তারা শোষণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে চাই। বহুজাতিক কোম্পানি, সংস্থা, ব্যাংক নিরীহ জনগণকে এক হাতে কিছু দিয়ে অন্য হাতে সর্বস্ব কেড়ে নেয়। পর্যটন শিল্পের ক্ষেত্রেও দেখা যায় স্থানীয় অধিবাসীদের কয়েকজনকে বেয়ারা, বয় জাতীয় চাকুরী দিয়ে মানুষের চরিত্রকে ধ্বংস করে, সমাজকে কলুষিত করে বিনা বাধায় তারা মুনাফা আদায় করতে চাই। সবসময়ই ষড়যন্ত্রের জালে আবদ্ধ রাখা হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় অধিবাসীদের। কখনো পাহাড়ী-বাঙ্গালী বিভেদ, কখনো ভাইয়ে-ভাইয়ে বিভেদ, কখনো জাতিতে-জাতিতে বিভেদের জাল বোনা হয়েছে। ঠিক তেমনি বর্তমানেও পর্যটন শিল্পকে কেন্দ্র করে নতুন মায়ার জাল বোনা হচ্ছে। এই মায়ার জাল থেকে সফলকে সচেতনভাবেই অতীতের মত প্রতিরোধ করতে হবে। তা করতে না পারলে শাসকের ফাঁদে পড়ে সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়বে এ অঞ্চলের জনসাধারণ।

কবিতা

এখনও আমরা অমানুষ

ল্যারা চাকমা শাকুরা

এখনও এত কিছুর পর এত দীর্ঘ পথ পেরিয়ে
শূণ্য হাতে এসে দাঁড়িয়ে,
আজও আমরা অমানুষ, নারী।
পেছনে কত খাদ পেরিয়ে এলাম, কত শ্বাপদ সংকুল বাঁধ
সেই গা শিউরে ওঠা অজস্র রাত্রির নিষ্ঠুরতা,
মিথ্যা আশ্বাস, সংশয়, ভয়, উপবাসের কালযাপন;
কিংবা হাঁপিয়ে ওঠা চার দেয়ালের ঘন অন্ধকারে
মৃত্যুর শীতল প্রহর গোণা?
সে সমস্তই আজও চোখের সামনে গড়িয়ে নামে।
আমাদের উপর অর্পিত হওয়া -
পৃথিবীর কোটি কোটি বছরের পুরণো সংস্কার,
যেন অভিশপ্ত এক জীবনকাহিনী।
পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ন্যায় এর দুর্নিবার আকর্ষণে
আমরা আত্মসমর্পণ করি জন্ম জন্মান্তরে
বিলিয়ে দিই সমগ্র সত্তা।
যেন কিছু ভাবার ইচ্ছে নেই, প্রয়োজন নেই,
তাছাড়া অবসরও বা কোথায়?
সংসারের খাঁচায় আমরা বন্দী, চারদিকে মরণদর্শী অন্ধকার
এমতাবস্থায় কি করে জানবো-
আলোর ফোয়ারার বাইরে অজস্র হিংস্রতা?
আমাদের উপর নিক্ষিপ্ত হওয়া
অমানুষিক উৎপীড়ন, বঞ্চনা, নির্যাতন?
কিন্তু সত্যি এভাবে ফুরিয়ে গেলে তো চলবে না?
তাই চলো, চলো পৃথিবীর সর্বহারার দল (নারী)
রহস্যের সমস্ত ঘেরাটোপ পেরিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ি।
সবাই একাত্ম হয়ে ঘোষণা করি-
আর নয় নারী হওয়া, নারী থাকা
এবার আমরা মানুষ।

বিভেদপন্থীদের প্রতি

তনয় দেওয়ান

আমার স্মৃতিতে ভাসছে সেই সব সহযোদ্ধার মুখ
যাদেরকে নিয়ে একসাথে মিছিলে হেঁটেছি
শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরিত করেছি রাজপথ।
মনে পড়ছে তাদের সেই সব জ্বালাময়ী ভাষণ
যা আজও আমরা দিয়ে যাচ্ছি
মাইকের পর মাইকে প্রতিধ্বনি তুলে,
জনতার সমাবেশে আর করতালি পেয়ে।
তারা আজ নেই, কেন নেই সে কথা হয়তো আমি বা
তারাও জানে না।
শুধু জানি সেই মিছিলের সকল হাত পা সমান ছিল না
সেই শ্লোগানের সকল কণ্ঠস্বর সমান ছিল না।
এখন আমি প্রতিদিন খবর পায়- তারা তাড়া করছে
আমাদের সহযোদ্ধাদের
যেভাবে একসময় করতো আর্মীরা।
বাড়ী পোড়াচ্ছে, অপহরণ করছে কখনো কখনো করছে খুন
লেঃ ফেরদৌস আর কখনো মেজর মেহবুব হয়ে।
এক সময় সবাই স্বপ্ন দেখতাম-
ল্যাটিন আমেরিকার চে গুয়েভারা হবো
হবো লং মার্চের কোনো অগ্রপথিক
অথবা
মাতৃভূমি রক্ষার্থে জলপাই রঙের পোষাক পড়ে
লারমা সেনানী হয়ে চষে বেড়াবো
শঙ্খ, কাচালং, রামগড়, বরকল, ফেনী।
দীঘিনালার মাইনী উপত্যকায় হবে আমাদের জয়ন্তী
ক্রমাগত চেঙ্গী থেকে নেমে আসবো কর্ণফুলীর মোহনায়।
স্বপ্ন শেষে এক সীমাহীন অস্তিত্বের সন্ধানে যখন
একে অপরকে আবিষ্কার করি
তখন তাদের রাইফেল তাক করেছে আমাকে
আর
আমারটা তাদেরকে।

সংবাদ প্রবাহ

চুক্তি লঙ্ঘন করে উন্নয়ন বোর্ড চেয়ারম্যান নিয়োগ

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি লঙ্ঘন করে গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে খাগড়াছড়ি থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়াকে নিয়োগ প্রদান করেছে। জনসংহতি সমিতি এই নিয়োগের তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে তথাকথিত অর্থনৈতিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে তৎকালীন সরকার ১৯৭৬ সালে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড' গঠন করে। একপর্যায়ে সেনাবাহিনীর ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জিওসিকে চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দিয়ে সরকার উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে সেনাবাহিনীর জন্য অবকাঠামো নির্মাণ, অনুপ্রবেশকারীদের জন্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান তথা কাউন্টার ইন্সার্জেন্সীর কাজে যাবতীয় বরাদ্ধ ব্যয় করে। ফলে এই বোর্ড একদিকে সামরিক শাসন ও অন্যদিকে দুর্নীতিগ্রস্থ হয়ে লুটপাট কায়েম করে। তাই ১৯৯৭ সালে চুক্তির মাধ্যমে এই বোর্ডকে একজন উপজাতীয়কে চেয়ারম্যান করে গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিমূলক করার জন্য বিধান রাখা হয়। পরে বীর বাহাদুরকে এই বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দিয়ে এটি নতুনভাবে যাত্রা শুরু করে।

উল্লেখ্য যে, চুক্তির 'গ' খন্ডের ১০নং ধারায় রয়েছে যে, "পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, পরিষদের (পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ) সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবে এবং উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার যোগ্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার প্রদান করিবেন। **কিন্তু চুক্তির উক্ত ধারাকে লঙ্ঘন করে সরকার আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়াকে নিয়োগ দিয়ে নতুন করে সংকট সৃষ্টি করেছে এবং জুম্ম জনগণের ন্যায্য অধিকারের উপর আঘাত হেনেছে। কেননা, আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া একজন অউপজাতীয় ব্যক্তি এবং তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবেও বিবেচিত হতে পারেন না। সরকারের এই চুক্তি পরিপন্থী নিয়োগাদেশের প্রতিবাদে ২০ ফেব্রুয়ারী ২০০২ জনসংহতি সমিতির উদ্যোগে তিন পার্বত্য জেলায় বিক্ষোভ সমাবেশ আয়োজন করে জেলা প্রশাসকেত্রয়ের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর নিকট স্মারকলিপি পেশ করা হয়। স্মারকলিপিতে দাবী করা হয় যে - ১. অনতিবিলম্বে জনাব আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়ার পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগাদেশ বাতিল করা। ২. অনতিবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক একজন যোগ্য উপজাতীয় ব্যক্তিকে নিয়োগ প্রদান করা। ৩. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ ও দ্রুত বাস্তবায়ন করা।**

পার্বত্য জেলা পরিষদকে আরেক দফা দলীয়করণ

বিগত ১২ ফেব্রুয়ারী ২০০২ মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে একটি নোটিশ জারী করে ১৯৮৯ সালে গঠিত তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদ ৫ সদস্যের সমন্বয়ে পুনর্গঠন করেছে। পুনর্গঠিত জেলা পরিষদে বান্দরবানে চেয়ারম্যান বানানো হয়েছে ম্যামাচিং মারমাকে, খাগড়াছড়িতে নক্ষত্রলাল ত্রিপুরাকে আর রাঙামাটিতে ড. মানিকলাল দেওয়ানকে। প্রতিটি পরিষদে চারজন করে সদস্য রাখা হয়েছে।

বিগত ২০০১ সালের ১লা অক্টোবরের সাধারণ নির্বাচনে বিএনপি'র নেতৃত্বে চার দলীয় জোট ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদকে পুনর্গঠিত করবে বলে জোর গুজব শোনা যায়। কিন্তু সরকারের ১০০ দিনের কর্মসূচীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে ঠাঁই না দেয়ায় জেলা পরিষদগুলো পুনর্গঠন করতে দেরী হয়ে যায়। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে 'ধীরে চলা এবং কালক্ষেপণ করার নীতি' অবলম্বন করছে বলেও সচেতন মহল ধারণা করছে। ১৯৮৯ সালের ২৫ জুন ভোটারবিহীন নির্বাচনের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার পরিষদ নাম দিয়ে তিন পার্বত্য জেলায় তিনটি পরিষদ গঠন করে। এই পরিষদগুলোকে ১৯৯৭ সালের চুক্তি মোতাবেক সংশোধন করে পার্বত্য জেলা পরিষদ নাম করা হয়। দীর্ঘ একযুগ সময় অতিবাহিত হলেও কোন সরকারই এই সকল পরিষদগুলোকে নির্বাচনের মাধ্যমে পুনর্গঠিত করার উদ্যোগ নেয়নি। বরং যে সরকার ক্ষমতায় এসেছে সে সরকারই নিজের দলীয় কর্মী দিয়ে পরিচালনা করেছে। উন্নয়নের নামে প্রাপ্ত সকল বরাদ্দ নিজেদের পকেটস্থ করে জেলা পরিষদগুলোকে দলীয় কার্যালয়ে পরিণত করেছে। ফলে অত্রাঞ্চলের সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের দাবী হলো এসকল পরিষদের নির্বাচনের ব্যবস্থা করে জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা।

পিসিপি রাঙ্গামাটি জেলা শাখার মাদক বিরোধী কর্মসূচী

পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ রাঙ্গামাটি জেলা শাখার উদ্যোগে রাঙ্গামাটি জেলা শহরে মাদক বিরোধী গ্রহণ করা হয়। উক্ত কর্মসূচী উপলক্ষ্যে পিসিপি কর্তৃক প্রকাশিত প্রচারপত্রে বলা হয় যে, বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারা দেশে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক অসহনীয় অবস্থা বিরাজ করছে। সুষম পরিকল্পনার অভাবে দেশে দিন দিন বেকার ও ভূমিহীনের সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। বর্তমানে দেশে এক কোটির কাছাকাছি শিক্ষিত যুবক-যুবতী গ্লানিকর বেকার জীবন যাপন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। জ্বালানী তেল, গ্যাস, বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। একদিকে সমাজের প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্ন অন্যদিকে কঠিন বাস্তবতার নির্মম আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে এই বেকার যুব সমাজ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ছে। বেকার জীবনের অসহনীয় ও গ্লানিকর যন্ত্রণা লাঘবের চেষ্টায় বিভিন্ন মাদক দ্রব্য সেবন করে নির্জীব প্রাণীতে পরিণত হয়ে এ যুব সমাজ নিজেকে নিজে তিলে তিলে ক্ষয় করে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

প্রচারপত্রে আরো বলা হয় যে, সারা দেশের এই ভয়াবহ চিত্রের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের ছাত্র-যুব সমাজের চিত্রও ব্যতিক্রম নয়। বরঞ্চ বলা যায় যে, দেশের অন্যান্য অঞ্চলের চাইতে পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থা আরো বেশী মারাত্মক ও ভয়াবহ। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান ও এতদাঞ্চলে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সনে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু বিগত ও বর্তমান সরকার চুক্তি বাস্তবায়নে উদাসীনতা ও গড়িমসির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক পরিস্থিতি দিন দিন অবনতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। হত্যা, অপহরণ, চাঁদাবাজি, ডাকাতি ইত্যাদি অপরাধমূলক কর্মকান্ড উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারী, আধা-সরকারী, পরিষদীয় ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে পাহাড়ীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের চাকুরী সুযোগ প্রদান করার বিধান করা হলেও সরকার এক্ষেত্রে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের ছাত্র-যুব সমাজের মধ্যে চরম হতাশা ও ক্ষোভ বিরাজ করছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ঘরে ঘরে আজ হাজার হাজার শিক্ষিত অর্ধ-শিক্ষিত যুবক-যুবতী কর্মহীন অবস্থায় চরম হতাশা-নিরাশার মধ্যে জীবন-যৌবনের মূল্যবান সময় অতিবাহিত করতে বাধ্য হচ্ছে। এই হতাশা ও ক্ষোভ আজ এ অঞ্চলের ছাত্র-যুব সমাজকে বিপথে পা বাড়াতে উৎসাহিত করছে। একদিকে মানুষখেকো মুনাফালোভী ব্যবসায়ীদের নীতি-নৈতিকতাহীন মাদকদ্রব্য ও অশ্লীল ছবির অবাধ ব্যবসা, অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে সক্রিয় স্বার্থান্বেষী বিশেষ সুবিধাবাদী মহলের ন্যাক্কারজনক ষড়যন্ত্র পার্বত্য চট্টগ্রামের ছাত্র-যুব সমাজকে মাদকাসক্তি ও নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। এই সুবিধাবাদী স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামের ছাত্র-যুব সমাজের নৈতিক মেরুদন্ডকে চিরতরে পঙ্গু করে দেয়ার লক্ষ্যে দেখেও না দেখার ভান করে এসব ক্ষতিকর দ্রব্যসামগ্রীর অবাধে বাজারজাতের সুযোগ করে দিচ্ছে এবং পাশাপাশি নানা কায়দা-কৌশলে হতাশাগ্রস্থ ছাত্র-যুব সমাজকে এসব অপকর্মে প্ররোচিত করে চলেছে।

রাঙ্গামাটিসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে সিনেমা, স্যাটেলাইট ও ভিডিও দোকানে প্রকাশ্যে অশ্লীল ছবির রমরমা ব্যবসা চলছে। এসব ছবি প্রদর্শনের ফলে কচি মনের ছাত্রছাত্রীরা বিকৃত রুচি ও মানসিকতা নিয়ে বেড়ে উঠছে। এছাড়া বইয়ের দোকানে রয়েছে নানা ধরনের অশ্লীল ছবি ও কুরুচিপূর্ণ পর্ণ্য পত্র-পত্রিকা। এসব দেখে এতদাঞ্চলের ছাত্র-যুব সমাজ অধিকতর প্ররোচিত হচ্ছে জীবন ও নৈতিকতা নাশক অপসংস্কৃতির দিকে ধাবিত হতে।

এ কর্মসূচীর আওতায় ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০০২ ছাত্র-যুব সমাজকে মাদকাসক্তি ও নৈতিক অবক্ষয় থেকে রক্ষার্থে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ রাঙ্গামাটি জেলা শাখার পক্ষ থেকে রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসকের বরাবরে নিম্নোক্ত দাবীনামা সম্বলিত স্মারকলিপি

পেশ করে থাকে। দাবীগুলো হচ্ছে- ১. অবিলম্বে সিনেমা, স্যাটেলাইট ও ভিডিও দোকানে অশ্লীল ছবি এবং পর্ণ্য পত্র-পত্রিকার ব্যবসা বন্ধ করার কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হোক। ২. অবিলম্বে মাদক ব্যবসা বন্ধ ও মাদক ব্যবসায়ীদের গ্রেপ্তার করার যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হোক। ৩. সন্ত্রাস, হোটেলে পতিতাবৃত্তির ব্যবসা, চাঁদাবাজি, ছিনতাইসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক। ৪. মাদকাসক্তদের সুচিকিৎসা গ্রহণ ও যথাযথ পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। ৫. পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন সরকারী, আধা-সরকারী, পরিষদীয় ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের শূণ্যপদে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক লোক নিয়োগ করা হোক। ৬. পার্বত্য চট্টগ্রামের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক তিন পার্বত্য জেলায় পার্বত্য জেলা পুলিশবাহিনী গঠন করা হোক।

এ কর্মসূচীর আওতায় ২২ ফেব্রুয়ারী ২০০২ পিসিপির উদ্যোগে পেশাজীবিদের নিয়ে রাঙ্গামাটি শিল্পকলা একাডেমী এক মত বিনিময় সভা আয়োজন করে। এ সভায় বিশিষ্ট সমাজসেবক শ্রী নির্মলেন্দু ত্রিপুরাকে আহবায়ক এবং পিসিপি রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সভাপতি সুদীর্ঘ চাকমাকে সদস্য-সচিব করে করে ১৫ সদস্যবিশিষ্ট 'অপসংস্কৃতি ও মাদক বিরোধী কমিটি' গঠন করা হয়। এ কমিটির অন্যান্য সদস্যদের অন্যতম হচ্ছেন শ্রী বিজয় কেতন চাকমা, শ্রী জয় নারায়ণ চাকমা, ডাঃ পরশ খীসা, শ্রী শিশির চাকমা ও ডাঃ মৃণাল কান্তি চাকমা। এ কমিটির উদ্যোগে শিল্পকলা একাডেমীতে ৩ মার্চ ২০০২ এক সমাবেশ আয়োজন করা হয়। সমাবেশ শেষে শিল্পকলা একাডেমী প্রাঙ্গণ থেকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় পর্যন্ত এক র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালী শেষে রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বরাবরে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। উক্ত স্মারকলিপিতে রাঙ্গামাটির প্রায় আড়াই হাজার অধিবাসী স্বাক্ষর প্রদান করেন।

বিশ্বনারী দিবস উদযাপিত

পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির উদ্যোগে গত ৮মার্চ জাতিসংঘ ঘোষিত' বিশ্ব নারী দিবস' খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটিতে পালন করা হয়েছে। খাগড়াছড়িতে আয়োজিত জনসমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির সভাপতি ও আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা। এতে সভাপতিত্ব করেন মহিলা সমিতির সহসভানেত্রী জ্যোতিপ্রভা লারমা। "সমাজে নারীরাও মানুষ" এই শ্লোগানকে নিয়ে এবারের নারী দিবসটি উদযাপিত হয়। খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে শত শত নারী-পুরুষ সমাবেশে যোগদান করেন। এতে আরও বক্তব্য রাখেন জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির সভাপতি প্রভাকর চাকমা, নির্মল কান্তি দাশ ও শক্তিপদ ত্রিপুরা প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন শীলা দেওয়ান। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন যে, "সভ্যতার উষালগ্নে মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ ছিল না। মানব সভ্যতার এক পর্যায়ে এসে সমাজে বৈষম্য ও শোষণের সূত্রপাত ঘটে। ফলে নারীরা চরমভাবে মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম নারীদের জীবন আরও বেশী দুর্বিষহ। ধর্ষণ, খুন, অপহরণের মতো জঘন্য অপরাধের শিকার এই জুম্ম নারীরা। তাছাড়া পারিবারিক দাসত্ব নারীদেরকে মানুষের মতো মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকতে দেয় না। তাই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পারিবারিক জীবনে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ছাড়া সমাজের প্রগতি সাধিত হওয়া অসম্ভব।"

রাঙামাটিতে ষ্টেডিয়াম সংলগ্ন জিমনিসিয়াম প্রাঙ্গনে আয়োজিত এক জনসমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির সহ-সভাপতি জননেতা উষাতন তালুকদার। সভাপতিত্ব করেন মহিলা সমিতির সভাপতি শ্রীমতি মাধবীলতা চাকমা। রাঙামাটি সদর থানার বিভিন্ন এলাকা থেকে শত শত নারী পুরুষ উক্ত সমাবেশে যোগদান করেন। এতে অন্যান্যদের মধ্যে আরও বক্তব্য রাখেন নির্মলেন্দু ত্রিপুরা, বেগম রওশন আরা, উমে মং, বোধিসত্ব চাকমা প্রমুখ। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন অরুমিতা চাকমা। সমাবেশে বক্তারা নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে লড়াই করার আহবান জানান। সমাবেশের পরে জিমনিসিয়াম থেকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় পর্যন্ত র‍্যালী বের করা হয়।

পানছড়ি জেএসএস কার্যালয়ে সেনাবাহিনীর হানা

পানছড়ি সেনা জোনের জোন কমান্ডার লে. কর্ণেল ফারুক এর নেতৃত্বে ৫০/৬০ জনের একটি আর্মী দল গত ৫ ফেব্রুয়ারী ২০০২ মঙ্গলবার রাত ৮টার দিকে জেএসএস পানছড়ি থানা কার্যালয় ঘেরাও করে তল্লাশী চালায়। তল্লাশীকালে কার্যালয়ের তালা, জানালা ভাঙচুর করা হয়। সেনা কর্মকর্তারা জেএসএস অফিসে অস্ত্র রাখার মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করে এই তল্লাশী চালায়। কিন্তু তল্লাশীতে কার্যালয়ে কোনো অস্ত্র পাওয়া যায়নি। এসময়ে পার্শ্ববর্তী বাড়ীতে জেএসএস সদস্য সন্তোষ চাকমা (রূপান্তর) অবস্থান করছিলেন। তাকে মহালছড়িতে খুন হওয়া রূপায়ন খীসা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এসময় আর্মীরা রূপান্তর চাকমার বাড়ীতে ঘুমন্ত একজন মহিলাকে মশারী উল্টিয়ে ঘুম থেকে তুলে বন্দুকের বাথ দিয়ে আঘাত করে। তাছাড়া থানা শাখা কার্যালয়ের পার্শ্ববর্তী কলেজ গেইট এলাকার নিম্নোক্ত ৬টি বাড়ীতেও তল্লাশী চালায়।

১. সন্তোষ বিকাশ চাকমা(৪৭), পীং-মৃত সুকোমল চাকমা, ২. মিসেস অমরি চাকমা (২৮), স্বামী-সম্প্রীতি চাকমা, ৩. মিসেস নয়না চাকমা (২৬), স্বামী- যুদ্ধ মণি চাকমা, ৪. মিসেস চন্দ্রদেবী চাকমা (২৫), স্বামী-মৃত স্বাধীন মঙ্গল চাকমা, ৫. ধনঞ্জয় চাকমা(৪৫), পীং-মৃত প্রাণবন্ধু চাকমা, ৬. বিনয় জ্যোতি চাকমা (২৭) পীং- মৃত সুকোমল চাকমা, ৭. রবি মোহন চাকমা(২৭), পীং-দেবেন্দ্র চাকমা, ৮. মিস কান্দরী চাকমা(১৫), পীং-মৃত তীর্থময় চাকমা।

আর্মীরা শুধু বাড়ী তল্লাশী নয়, কান্দরী চাকমাসহ মহিলাদের শ্লীলতাহানি করে এবং ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। তাছাড়া বাড়ীঘর তছনছ করে মারধরও করেছে। এতে এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। পানছড়ির উত্তেজনার খবর পেয়ে খাগড়াছড়ি থেকে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক একজন ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটকে ঘটনাস্থলে পাঠান। পুলিশ সুপারও তার প্রতিনিধি প্রেরণ করে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জেএসএস এর সহযোগিতা চাইলে জেএসএস খাগড়াছড়ি জেলা সভাপতি ধীর কুমার চাকমা ও সুধাকর ত্রিপুরা তাদের সঙ্গে পানছড়িতে যান। প্রশাসনের প্রতিনিধিগণ পরবর্তীতে এধরণের ঘটনা আর না ঘটার বিষয়ে আশ্বাস প্রদান করে।

সেনাবাহিনীর এহেন কার্যকলাপের প্রতিবাদে জেএসএস ও পিসিপি ৬ফেব্রুয়ারী বিক্ষোভ মিছিল ও সড়ক অবরোধ কর্মসূচী ঘোষণা করে। পরে প্রশাসনের আশ্বাসের প্রেক্ষিতে সড়ক অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়।

বিজু উৎসব উদযাপিত

পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের জাতীয় ও ঐতিহ্যবাহী সামাজিক উৎসব 'বিজু' যথাযথ উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে উদযাপিত হয়েছে। বাংলা বছরের শেষ দুদিন এবং নতুন বছরের ১ম দিনটি মিলে মোট ৩দিন ধরে এই উৎসব পালিত হয়। চাকমা ভাষায় বিজু ৩টি পর্বে বিভক্ত-১. ফুল বিজু, ২. মূল বিজু ও ৩. গজ্যাপজ্যা দিন। তাছাড়া ত্রিপুরারা বৈসুক , তংচঙ্গ্যারা বিষু ও মারমারা সাংগ্রাই নামে এই উৎসবকে অভিহিত করে থাকে। বিজু উৎসব উপলক্ষে রাঙামাটি শহরে র‍্যালী, মেলা, আলোচনা সভা, বলি খেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, তুম্বুরু খেলাসহ নানাবিধ ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলার আয়োজন করা হয়।

এ উপলক্ষ্যে ১১ এপ্রিল বিজু উদযাপন কমিটির উদ্যোগে রাঙামাটি পৌর চত্বর হতে শিল্পকলা একাডেমী পর্যন্ত একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালীর নেতৃত্ব দেন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা। র‍্যালী উদ্বোধন করে তিনি বলেন, 'আজকের বিজু আরও আনন্দঘন ও উদ্দীপনাময় হতে পারতো যদি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে সরকার এগিয়ে আসতো। তাই আমি নতুন সরকারের কাছে চুক্তি বাস্তবায়নের আহ্বান জানাই।' র‍্যালীতে সমাপনী বক্তব্য ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী মনি স্বপন দেওয়ান।

৫-৭ এপ্রিল পর্যন্ত জুম্ম ঈসথেটিক্স কাউন্সিলের উদ্যোগে প্রতিবারের মতো এবারও ৫ম পার্বত্য চট্টগ্রাম আদিবাসী সংস্কৃতি মেলা আয়োজন করা হয়। তাছাড়া ১০ এপ্রিল জুম্ম লেখক ফোরাম এর উদ্যোগে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। হিল ট্রাইবস ফটোগ্রাফিক্স সোসাইটির উদ্যোগে ৭-৯ এপ্রিল পর্যন্ত আলোকচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

এছাড়াও খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানেও বিভিন্ন কর্মসূচী পালিত হয়। বান্দরবানে সাংগ্রাই উপলক্ষে ঐতিহ্যবাহী 'পানি খেলা' অনুষ্ঠিত হয়।

বান্দরবানে ভূমি বেদখল অব্যাহত

বান্দরবান শহরের উপকণ্ঠে ক্যাচিং কার্বারী পাড়ার ৪২টি মারমা পরিবারের জায়গা-জমি জেলার প্রভাবশালী বিএনপি-আওয়ামী লীগ নেতারা দখল করে নিচ্ছে। জানা গেছে যে, ৮ ফেব্রুয়ারী ২০০২ আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন শ্রমিক লীগের নেতা আবদুল মাজেদ (জেলা শ্রমিক লীগের আহ্বায়ক ও পৌরসভার ওয়ার্ড কমিশনার) ও কাজী মজিবুর রহমানের নেতৃত্বে একদল লাঠিয়াল বাহিনী মারমাদের উক্ত জায়গা-জমি দখল করে নেয় এবং সেখানে কৃষক শ্রমিক ভূমিহীন পরিষদ নামে ভূঁইফোঁড় একটি সংগঠনের সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দেয়। তাদের দখলের ১২ দিন পর গত ২০ ফেব্রুয়ারী ২০০২ বিএনপি'র কতিপয় নেতা-কর্মীও জায়গাটি দখল করে নেয়। তারা উক্ত কৃষক শ্রমিক ভূমিহীন পরিষদের সাইনবোর্ড সরিয়ে দিয়ে জিয়া নগর নামে একটি সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দেয়।

মারমাদের উক্ত জায়গা দখলের সময় মারমারা জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের সহায়তা চেয়েও তারা কোন সহযোগিতা পায়নি বলে অভিযোগ করেছে। এ সময় একদল সেনা সদস্য ঘটনাস্থলে আসলেও দখলদারদের বিরুদ্ধে কোন কিছু করা হয়নি বলে জানা যায়। এদিকে উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে জেলা প্রশাসন ২০ ফেব্রুয়ারী উক্ত এলাকায় ১৪৪ ধারা জারী করে থাকে। কিন্তু ১৪৪ ধারা জারী হওয়ার ফলে দখলদারদের উক্ত জায়গা দখলে পরোক্ষভাবে সহায়ক হয় বলে মারমা অধিবাসী জানায়। অপরদিকে ৯ মার্চ ২০০২ কৃষক শ্রমিক ভূমিহীন পরিষদের সাইনবোর্ড নিয়ে দখলদার সেটেলাররা বান্দরবান শহরে এক বিক্ষোভ মিছিল করে এবং মারমারা তাদেরকে হত্যার হুমকি দিয়েছে বলে মিথ্যা অভিযোগ প্রচার করে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়ায়। ক্যাচিং কার্বারী পাড়ার মারমা অধিবাসী জানায় যে, বসতিস্থাপনকারী সেটেলার বাঙালীদের হত্যার হুমকি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে জায়গা দখল করার হীন উদ্দেশ্যে দখলকারীরা এসব অপপ্রচারনা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে।

উল্লেখ্য যে, দখলের দীর্ঘদিন পরও অবৈধ দখলকারীদের উচ্ছেদের ব্যাপারে প্রশাসন রহস্যজনকভাবে নিরবতা পালন করে চলেছে। দখলকারীরা এখনো বহাল তবিয়তে উক্ত জায়গা দখল করে রয়েছে।

বান্দরবানে জুম্ম মহিলা অপহৃত

সেটেলার বাঙালী কর্তৃক আবারও একজন জুম্ম মহিলাকে অপহরণ করা হয়েছে। গত ১৩ মার্চ বান্দরবান আলীকদমের রোয়াংবোর হতে আলীকদমে এসএসসি পরীক্ষা দিতে এলে পরীক্ষার্থীনী কল্পনা চাকমা (১৬) পরীক্ষার আগের দিন সেটেলার সন্ত্রাসী কর্তৃক অপহৃত হয়। এ অপহরণের বিরুদ্ধে হিল উইমেন্স ফেডারেশন তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেছে। শুধু তাই নয়, অবিলম্বে তাকে উদ্ধারের জন্য জোর দাবী জানানো হয়।

লংগদুতে পিসিপি কর্মীদের উপর সেনাবাহিনীর নির্যাতন

গত ২৪ এপ্রিল বুধবার লংগদুর করল্যাছড়ি সাবজোনের কমান্ডার লেঃ জাবেদ(১৬ইবেঙ্গল) কর্তৃক পিসিপির নেতাকর্মীদের নির্যাতন করা হয়। এতে পিসিপির লংগদু থানা শাখার সভাপতিসহ ৬জনকে গ্রেফতার করে লংগদু থানায় একরাত হাজতবন্দী করে রাখা হয়। সংগঠনের আসন্ন প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল উপলক্ষে তারা করল্যাছড়ি বাজারের বাজার কমিটির কাছ থেকে আর্থিক সহযোগিতা চাইতে গেলে লেঃ জাবেদ চুক্তিবিরোধী অঙ্গুহাত দেখিয়ে তাদের গ্রেফতার করে। সেনাসদস্যরা তাদের কাছ থেকে টাকা পয়সা ও রশিদ বই ছিনিয়ে নেয়। পূর্বেই বাজার কমিটির পক্ষ থেকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের ভিত্তিতে তারা করল্যাছড়ি বাজারে গিয়েছিল। এপর্যন্ত উক্ত লেঃ কর্তৃক পিসিপির সদস্যরা তিনবার নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। সেনাবাহিনীর বারবার এরূপ নির্যাতনের প্রতিবাদে স্থানীয় জনগণ পিসিপির আহ্বানে করল্যাছড়ি বাজার অনির্দিষ্ট কালের জন্য বয়কট করা শুরু করেছে। উক্ত তারিখে যেসকল ছাত্র নির্যাতনের শিকার হন তারা হলেন-১. মঙ্গলকান্তি চাকমা পীং-রবীন্দ্র লাল চাকমা,(সভাপতি-পিসিপি, লংগদু) ২. বিত্ররঞ্জন চাকমা (সাধারণ সম্পাদক) ৩. মনায়ন চাকমা(অর্থ সম্পাদক) ৪. সমদীপ্ত চাকমা (সদস্য) ৫. প্রাণেশ চাকমা (সদস্য) ৬. চিত্তি চাকমা (সদস্য)।

জীবতলীতে সেনাবাহিনীর বর্বরতা

গত ১৯ মার্চ ২০০২ রোজ মঙ্গলবার রাত আনুমানিক ৯.৩০ ঘটিকায় কাঙাই ব্রিগেডের নিয়ন্ত্রণাধীন হাজাছড়া এস ব্যান্ড আর্মী ক্যাম্পের (১৪ বেঙ্গল) দায়িত্বরত জনৈক ক্যাপ্টেন ও সুবেদার মুকলেসুর রহমানের নেতৃত্বে একদল সেনা বিনা কারণে ১নং জীবতলী ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের বাকছড়ি গ্রাম ঘেরাও করে নিরীহ গ্রামবাসীদের মারধর এবং অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেছে। সেনা সদস্যদের বর্বর নির্যাতনের ফলে উক্ত গ্রামের নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ মারাত্মকভাবে আহত হন। ১) বিমল কান্তি চাকমা (৩০), পীং মনু রঞ্জন চাকমা; ২) বাদোই চাকমা (১৭), পীং বীরগুরাম চাকমা; ৩) চিগন কান্তি চাকমা, (১৪), পীং মনু রঞ্জন চাকমা; ৪) বীর শান্তি চাকমা(১৫), পীং মঙ্গল কুমার চাকমা; ৫) গুলচোগা চাকমা (১৪), পীং সমমুনি কার্বারী ও ৬) সোনারাম চাকমা, ৩০ বছর, পীং কুনেন্দু চাকমা প্রমুখ মারাত্মকভাবে আহত হয়। এছাড়া মনু রঞ্জন চাকমা (৭০), পীং রাত্তোমুনি চাকমা ও শান্তি লাল চাকমা, (৩৫), পীং রাত্তোমুনি চাকমার বাড়ী ভাংচুর করে। অত্র ইউনিয়নের কাটাছড়া এলাকায় নতুন সেনা পোষ্ট বসিয়ে নিরীহ জনসাধারণকে তল্লাসী, অহেতুক জিজ্ঞাসাবাদ, চলাফেরায় হস্তক্ষেপ করায় স্থানীয় জনগণ হয়রানি শিকার হচ্ছে। সেনাবাহিনীর এহেন তৎপরতার ফলে এলাকাবাসীর মধ্যে চরম নিরাপত্তাহীনতা, ক্ষোভ ও উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে।

সেনাসদস্যদের বর্বরতার বিরুদ্ধে গত ২৫ মার্চ জীবতলী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। এতে নিম্নোক্ত দাবীনামা জানানো হয়- ১. সেনাবাহিনীর উক্ত ঘটনা সুষ্ঠু তদন্ত পূর্বক দোষী সদস্যদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা; ২. ক্ষতিগ্রস্থ গ্রামবাসীদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা; ৩. অবিলম্বে সেনাবাহিনীর হয়রানিমূলক অপতৎরতা বন্ধ করা;৪. অবিলম্বে সেনাবাহিনীর উপর ন্যস্ত 'অপারেশন উত্তরণ' প্রত্যাহার করা; ৫. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক সেনা, আনসার, এপিবি ও ভিডিপির সকল অস্থায়ী ক্যাম্প গুটিয়ে নেয়া।

উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সেনা, আনসার, এপিবি ও ভিডিপির অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহারের সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকলেও আজ অবধি তা বাস্তবায়িত হয়নি। বরঞ্চ 'অপারেশন উত্তরণ' জারী করে সেনাবাহিনীকে পার্বত্য চট্টগ্রামে কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। ফলে সাধারণ প্রশাসনের উপর নানাভাবে কর্তৃত্বসহ সেনা অপারেশন, নারী ধর্ষণ, মারধর, ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ ইত্যাদি হয়রানিমূলক কার্যকলাপ চলছে।

খিরাম ক্যাম্পের আর্মী ও ইউপিডিএফ এর যৌথ চাঁদাবাজি

২০০১ সালের জুলাই/অগাষ্ট মাস থেকে বর্তমান পর্যন্ত ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী চক্র ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার ঘাগড়া জোন নিয়ন্ত্রণাধীন খিরাম ক্যাম্পের ৫০ ইবিআরের সেনা সদস্যরা কাউখালী উপজেলার বর্মাছড়ি এলাকায় যৌথভাবে প্রকাশ্যে চাঁদাবাজি চালিয়ে আসছে। এ লক্ষ্যে ইউপিডিএফ এর সন্ত্রাসী নেতা তারেক মারমা ও খিরাম ক্যাম্পের সুবেদার বশির এর মধ্যে নিয়মিত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তাদের মধ্যে গোপন সমঝোতা রেখে তারা মাসোয়ারা হিসেবে ব্যবসারী থেকে শুরু করে গাড়ী, বনজ দ্রব্যাদিসহ সাধারণ কৃষক ও বিক্রেতাদের কাছ চাঁদা আদায় করে থাকে। আদায়কৃত অর্থ ইউপিডিএফ ও ক্যাম্পের সেনা সদস্যদের মধ্যে ভাগ বন্টন হয়ে থাকে। সুবেদার বশির কর্তৃক ইউপিডিএফ এর সন্ত্রাসী তারেক মারমাকে ক্যাম্পে নিয়মিত দাওয়াত দিয়ে থাকে বলে জানা যায়। তাদের সন্ত্রাসী তৎপরতায় এলাকাবাসীর মধ্যে প্রচন্ড ক্ষোভ বিরাজ করছে। কিন্তু স্বয়ং সেনা ও ইউপিডিএফ এর সশস্ত্র লোকদের কাছে এলাকাবাসীর পক্ষে টু শব্দটি করারও কোন সুযোগ নেই। সরকারী বাহিনীর সেনা সদস্য ও সন্ত্রাসী সংগঠন ইউপিডিএফ এর সদস্যদের সশস্ত্র তৎপরতার কাছে এলাকাবাসী এখন জিম্মি হয়ে পড়েছে।

শুভ্রুষ ও সেটেলারদের চাঁদাবাজি ও চুক্তি বিরোধীতা

সম্প্রতি রাঙামাটি জেলার বরকল থানাধীন বরুনাছড়ি গুচ্ছগ্রামের বহিরাগত সেটেলার বাঙালী ও ইউপিডিএফ সশস্ত্র চক্র চুক্তির বিপক্ষে তথা জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে একজোট হয়ে কাজ করার জন্য বোঝাপড়া করেছে। ফলে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের চেক পোস্ট হতে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী বিমল চাকমা ও মধু মিলন চাকমা (হীরালাল) কতিপয় সেটেলারের সহযোগিতায় গাছ বোঝাই বোট ও মৎস্য ব্যবসায়ীসহ সকল প্রকারের দেশীয় বোট হতে ব্যাপক চাঁদাবাজি করে চলেছে। তারা কাট্টলী বাজারে টোল আদায় পোষ্ট বসাবার জন্য সচেষ্ট

রয়েছে বলেও এলাকাবাসী জানিয়েছে। শুধু তাই নয় গত ১৩ জানুয়ারী ২০০২ তারিখে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী মধু মিলন চাকমা (৪০) পীং রঞ্জন্যা চাকমা, সাং পাগলীছড়া এবং সৃজন চাকমা (২৫) পীং সুরেশ মোহন কার্বারী, সাং উকছড়ি এবং সন্ত্রাসী সেটেলার সোহরাব হোসেন, শাহজাহান হাওলাদার, আলম ফরাজী ও আবুল গাজী যৌথভাবে ৫ জন বাঙালী মৎস্য শিকারীকে অপহরণ করে। তারা অপহরণের পর জেলেদেরকে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের ১০নং বরুনাছড়ি চেকপোষ্টের কাছে বেঁধে রাখে। এরপর মোটা অংকের মুক্তিপণ দাবী করে। এলকাবাসী জানিয়েছে এই তিনমুখী সখ্যতার পেছনে লক্ষ্য এক এবং তা হলো চাঁদাবাজি করা।

ইউপিডিএফের গুলিতে খুন হলেন সুজিত চাকমা

গত ২২ এপ্রিল পানছড়ি উপজেলার হাইস্কুলের সম্মুখে যাত্রা ছাউনির পাশে ইউপিডিএফের সশস্ত্র সদস্যদের গুলিতে নির্মমভাবে খুন হলেন জনসংহতি সমিতির পানছড়ি থানা কমিটির সহ সম্পাদক সজিত চাকমা (৩৫) পীং ব্রজহরি চাকমা। উক্ত ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হয় ত্রিরতন চাকমা। সেদিন রাত সোয়া ৯টার দিকে ত্রিরতন চাকমাকে নিয়ে সুজিত চাকমা মটর সাইকেল যোগে পানছড়ি বাজার থেকে কুড়াদিয়াছড়ায় যাচ্ছিল। মটর সাইকেল নিয়ে পানছড়ি হাই স্কুল সংলগ্ন যাত্রী ছাউনিতে পৌঁছলে সন্ত্রাসীরা অতর্কিতভাবে ৩০৩ রাইফেল দিয়ে গুলি বর্ষণ করে। এতে ঘটনাস্থলে সুজিত চাকমা নিহত হন এবং মারাত্মক আহত অবস্থায় ত্রিরতন চাকমাকে খাগড়াছড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করলেও পুলিশ প্রশাসন এখনো কাউকে গ্রেপ্তার করেনি।

মাটিরাংগায় ইউপিডিএফ কর্তৃক লুট ও হত্যার হুমকী

গত ৮ ফেব্রুয়ারী ইউপিডিএফ এর ২০/৩০ জন সন্ত্রাসী কিরেন্দ্র ত্রিপুরা (২০), চিকেন্দ্র ত্রিপুরা(২৫), গণেন্দ্র ত্রিপুরা(২০), সুজন চাকমা(২৫) এর নেতৃত্বে খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাংগা উপজেলাধীন তৈকুষা গ্রামের চুক্তি পক্ষের কর্মী খরীন বিকাশ ত্রিপুরার পিতা নীতিন্দ্র কুমার ত্রিপুরা (৪০) পিতা- বিষ্ণু কুমার ত্রিপুরা এর বাড়ী থেকে ২৫ আড়ি ধান ও অন্যান্য মুল্যবান জিনিস লুট ও এক জোড়া হালের গরু প্রকাশ্য দিবালোকে নিয়ে যায়। এই সময় খরীন বিকাশ ত্রিপুরাকে আত্মসমর্পণ না করলে বাড়ীঘর পুড়িয়ে ফেলার এবং পরিবারের সবাইকে গুলী করে হত্যা করার হুমকী দেয়া হয়। উল্লেখ্য যে, খরীন বিকাশ ত্রিপুরার বাবা একজন নিরীহ কৃষক। তিনি এমন অমানবিক পরিস্থিতির শিকার হওয়ায় এলাকায় তীব্র ক্ষোভ দানা বেঁধে উঠেছে।

চুক্তি বিরোধী কর্তৃক অপহরণ

১২ মার্চ ২০০২ ভোর ৪ টায় তপনজ্যোতি চাকমা ও মধুমঙ্গল চাকমার নেতৃত্বে চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা নিম্নোক্ত চারজন গ্রামবাসীকে বরকল থানাধীন বরনাছড়ি মৌজার দীঘলছড়ি নামক স্থান থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায়- ১। শ্রী লীলাময় কার্বারী পীং মৃত জুরান্যা চাকমা গ্রাম দীঘলছড়ি (জনসংহতি সমিতির গ্রাম কমিটির সভাপতি)।২। শ্রী শান্তি বিলাস চাকমা পীং খগেন্দ্র চাকমা গ্রাম দীঘলছড়ি ৩। শ্রী সুমন দেওয়ান (কোডেক এনজিও এর শিক্ষক) ৪। শ্রী কালা চাকমা।

লংগদুতে সেটেলার কর্তৃক ভূমি বেদখল ও হত্যার অপচেষ্টা

বিগত ১০/২/২০০২ইং রবিবার লংগদু উপজেলায় ১৭নং ঘনমোর মৌজাবাসী করুন চন্দ্র চাকমা তার স্ত্রী ও কন্যাসহ নিজ দখলীয় ৬০শতাংশ জমিতে ধান রোপন করতে গেলে নিম্নোক্ত বহিরাগত বাঙালীরা জমি বেদখল করার জন্য সকাল ৯টায় দা, কিরিচ ও লাঠি নিয়ে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এতে তার স্ত্রী ও কন্যা মারাত্মকভাবে আহত হয়। অহতদের জরুরীভিত্তিতে লংগদু সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মেডিক্যাল সার্টিফিকেটসহ ১১/২/২০০২ইং উক্ত থানায় মামলা দায়ের করা হলে আসামীরা গ্রেপ্তার হয়। কিন্তু পরে মন্নাফ মেম্বারের সুপারিশে মোঃ নজরুল ইসলাম ও মোঃ হোসেন আহম্মদ জামিনে মুক্তি পায়। আক্রমনকারী বহিরাগত বাঙালীরা হচ্ছে- ১। মোঃ নজরুল ইসলাম পীং মৃত আঃ রহমান, ২। মোঃ হোসেন আহম্মদ পীং মোঃ নজরুল ইসলাম, ৩। মোঃ আমীর হোসেন পীং নজরুল ইসলাম, ৪। মোঃ মোজাফ্ফর হোসেন পীং মৃত এরশাদ আলী, ৫। মোঃ আমীর হোসেন পীং অজ্ঞাত। যারা আক্রান্ত হয়েছেন– ১। বরুন চন্দ্র চাকমা ২। প্রিয়বালা চাকমা স্বামী বরুন চন্দ্র চাকমা, ৩। বাদনী চাকমা পীং বরুন চন্দ্র চাকমা, ৪। নিহার বালা চাকমা পীং মৃত অরুন চাকমা।

সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন বিষয়ে ঢাকায় সাংবাদিক সম্মেলন

গত ২৪ মার্চ পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির উদ্যোগে ঢাকার জাতীয় প্রেস ক্লাবে তিন পার্বত্য জেলায় প্রতিটিতে একটি করে সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের দাবীতে এক সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির সভাপতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য শ্রীমতি মাধবীলতা চাকমা। এতে সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে সমিতির বক্তব্য তুলে ধরেন মহিলা সমিতির সাধারণ সম্পাদক উমে মঙ। মহিলা সমিতির এই দাবীর সমর্থনে সংহতি প্রকাশ করেন হিল উইমেন্স ফেডারেশন, নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, কর্মজীবি মহিলা, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘসহ বেশ কটি নারী সংগঠন। এতে কল্পনা চাকমা, ওয়াইচিং প্রু মারমা, সীমা দেওয়ান, চৈতালী ত্রিপুরা প্রমুখ নারী অধিকার কর্মীগণও উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য যে, সরকারের তরফ থেকে দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৩ পার্বত্য জেলার জন্য একটি আসন ও বাদবাকী ৬১টি জেলার জন্য প্রতিটিতে একটি করে ৬১টি আসনসহ মোট ৬২টি আসনের প্রস্তাব করে বিলাকারে তৈরী করার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ নিয়ে গত ২৮ ফেব্রুয়ারী তিন পার্বত্য জেলার সর্বস্তরের অধিবাসীদের পক্ষ হতে প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি থেকে প্রকাশিত।
শুভেচ্ছা মূল্য ৫.০০ টাকা মাত্র।

JUMMA SAMBAD BULLETIN
Newsletter of the Parbatya Chattagram Jana Samhati Samiti (PCJSS)
Issue no. 28, 10th Year, April 2002. World Womens' Day Issue
Published by Information and Publicity Department of PCJSS from its Central Office, Kalyanpur, Rangamati, Bangladesh. Phone : +880-351-61248, E-mail: pcjss@hotmail.com.
Price: TK. 5.00 only